বাঁচতে

কলকাতা
অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

সবাই চায়

অসীম বর্দ্ধন

'BANCHTAY SABAY CHAYE' 2nd Edition
1959 by Asim Bardhan

প্রকাশক :
অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্ : পোষ্টবক্স ২৫৩৯ : কলকাতা ১

মুদ্রক :
তারা প্রেস : ৫৫বি, তারক প্রামাণিক রোড : কলকাতা ৬

মনের যত কারসাজি

শরীরটা বুঝি খারাপ লাগছে আজ? ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে গা-হাত-পা?' তা, শরীরের ভালমন্দ সবই আছে। আজ না হয় একটু ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে, কালই আবার ঠিক হয়ে যাবে। তবে একটা কথা বলব, শুনবেন কি? যখন তখন শরীর বেচারীকে 'নন্দ-ঘোষ'-এর মত সমস্ত দোষের ভাগী করাটা কি আপনার ভাল দেখায়? আমি বলি কী জানেন, শরীর ম্যাজ্ ম্যাজ্ করা বা অসুস্থ হওয়ার ব্যাপারে আপনার মনের কারসাজিটাও বড় কম নয়। শরীর খারাপ হওয়ার বহু কারণ আছে, যেগুলি পুরোপুরি মানসিক প্রভাব থেকেই জন্ম নিয়েছে। মন যদি থাকে ফুর্তিহীন, শরীরেও যেন জোর পাবেন না আপনি। ঘুম ভাল হবে না, খিদে কমে যাবে

আর কর্ম্মশক্তি যেন দিন দিন কমতেই থাকবে। যখন উৎফুল্ল বোধ করবেন তখন যেন কোন ঝঞ্ঝাটই নেই—খান্‌দান্‌ কাজ করুন, রাত্রে কষে ঘুম মারুন!

জানবেন, মনের প্রক্ষোভ বা ইমোশ্যনগুলো শরীরকে বড় নাড়া দিয়ে যায়! প্রক্ষোভের এক-একটা ঝড় আপনার দেহের কোন কোন গ্রন্থিকে এমনভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে যেতে পারে যে, অবসাদ ও উদ্বেগের আধিক্যে আপনি অল্পতেই কাহিল হয়ে পড়তে পারেন। এই সব প্রাক্ষোভিক কারণজনিত যে উদ্বেগ, তা যদি বেশী স্থায়ী হতে চলে, তাহলে বিশেষ কোনও গ্রন্থির অনবরত রসক্ষরণ বা রসরক্ষণে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্যে দেহের অন্যান্য স্বাভাবিক কাজকর্ম্মও সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হতে পারে। আশ্চর্য্য হতে হয় যে, এ ধরনের মানসিক উদ্বেগের দরুণ ব্লাড প্রেশার তো বটেই, অনেক সময় গ্যাষ্ট্রিক আল্‌সার জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিতেও মানুষকে কাত করে দিতে পারে!

মনোবিজ্ঞানকে যাঁরা শরীরবিজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা বলেন যে, মনের পৃথক কোন আসন দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় নেই। 'ক্রোমোসোম' নামে যে সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোটি কোটি প্রাণ-কণিকার রহস্যময় সমাবেশে এই দেহ গঠিত হয়েছে, তাদের সম্মিলিত ক্রিয়াই মনের অভিব্যক্তি। অতএব দেহ ও মন একই উপাদানে গঠিত। তবে খুব বেশী বিশ্লেষণ করতে গেলে বলতে পারা যায় যে, দেহ হলো মনের আবরণ মাত্র। প্রাণীবিজ্ঞানীদেরও এই অভিমত। যা-হোক, তাহলে যখন দেহ ও মন ঐ একই 'ক্রোমোসোম' প্রাণ-কণিকার সমবায়ে গঠিত, এবং দেহের সর্ব্বত্রই

মনের অবস্থান—তবে মানসিক অবনতি কেন দৈহিক অবনতির কারণ হবে না ?

আপনার দেহ যেমন চায় চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় মুখরোচক পুষ্টিকর খাদ্য-সম্ভার, মনেরও তেমনি প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাদ্যের। আপনার মনের খোরাক যা জোগান তা কেমন ধরনের ? খাদ্য তালিকার মধ্যে মুখ বদলের ব্যবস্থা আছে তো ? না কি, ব্যবসা ফাঁদবার মতলব, তাড়াতাড়ি দু' পয়সা গুছিয়ে নেবার কায়দা কিংবা অফিসে একটু ভাল 'র‍্যাঙ্ক'-এ যাবার চেষ্টাতেই মনকে ব্যস্ত রেখে দিয়েছেন ? ভেবে দেখুন তো, পরনিন্দা, অন্যের কাজের সমালোচনা—এগুলো অন্যান্য কাজের তুলনায় আপনি বেশী করছেন কি না। সবচেয়ে খারাপ, যদি আপনি অপরের প্রতি হিংসুটেপনা করতে থাকেন, আর আপনার মন যদি কারো প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকে! এসব-গুলোই কু-চিন্তা এবং ক্ষতিকর প্রক্ষোভের জন্ম দেয়। এরা দেহের ক্ষতিও করে মারাত্মক।

'আগামীকাল আপনি কি রকম অবস্থার মধ্যে থাকবেন সে সম্পর্কে কি ধরনের চিন্তা আপনার মনের মধ্যে জাগে ? অর্থাৎ নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি কি ভেবেছেন জানেন কি ? 'জানেন কি' বলতে হলো এই জন্যে যে নিজের মনের কথা জানা সত্যিই শক্ত ব্যাপার। তবে সম্মোহন প্রয়োগের সাহায্যে মনের অনেক চাপা কথা জানা যেতেও পারে। জানবেন, আজ আপনার অবচেতন মন যা ভাবছে আপনার অজ্ঞাতে (হ্যাঁ, অজ্ঞাতেই),—আপনাকে ঘিরে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে তারই ভিত্তিতে! যা আপনার ওপর ঘটবে বলে আপনি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করছেন,

কাল কিংবা পরশু তাই-ই ঘটবে আপনার জীবনে! খারাপ কোনও চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া তাই বারণ।

আপনার মনে কি কোন ভারী রোগে পড়ার ভয় জাগে? স্বাস্থ্যের অবনতির আতঙ্ক আপনার মনে কি সব সময়েই খচ্ খচ্ করছে? যা আপনার পক্ষে করা একরকম অসম্ভব, তাই নিয়ে কি কি দিনরাত আকাশ-কুসুম কল্পনা করছেন? তবে বলি, আপনি আপনার উদ্যমের অপচয় করছেন। উদ্যম সরবরাহ করে দেহের স্নায়ুগুলি; অতএব উদ্যমের বৃথা অপচয়ের দরুণ স্নায়ুগুলির কর্ম্ম-ক্ষমতার অপচয় হচ্ছে, ফলে আপনার দেহও হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।

মন আপনার দেহকে পরিচালিত করে—একথা জানেন নিশ্চয়ই। অতএব দেহের স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জন্যে যতখানি চেষ্টা-চরিত্র করেন, তার চেয়েও বেশী উদ্যোগ প্রয়োজন মনের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক মানুষই আজকাল তাঁদের দেহের অধীন হয়ে চলছেন। তাঁরা প্রায়ই বলেন, "উহুঁ—আমার পেটে এ সইবে না।" "বাতের রুগী আমি—এসব কি পারব?" এঁরা দেহকে অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের ওপর কর্ত্তৃত্ব করবার;—মন বেচারীও তাই মনমরা হয়ে পড়ে আছে!

অনেক সময়েই আমরা ভুলে যাই যে মনের প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই দেহ আমাদের হুকুমে হাজির! দেহ ভৃত্য, মন প্রভু। যদি ভৃত্যের উপর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করে ভৃত্যের পরামর্শ শুনে কাজ করতে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে প্রভু দুর্ব্বল। এ রকম প্রভু হওয়াটা কাজের কথা নয়।

আপনার দেহে যখনই কোন অনুভূতি জাগে, তখনই স্নায়ুমণ্ডলী সেই অনুভূতির তরঙ্গ বহন করে নিয়ে যায় মনের অন্দরমহলে। সেখানে সেই তরঙ্গের বিশ্লেষণ হয় এবং আনন্দ, যন্ত্রণা, ঠাণ্ডা, গরম বা যে-রকমেরই হোক না কেন, সেইরকম প্রতিক্রিয়া হয় আপনার দেহের ওপর মনেরই নির্দেশে। টেলিগ্রাফ-ক্লার্ক যেমন মোর্স-সঙ্কেত পাঠ করে অনুবাদ করে দেয় সুখ-দুঃখের বিচিত্র সংবাদ, মনও যেন তেমনি স্নায়ুর অনুভূতি-সঙ্কেতকে চেতনায় পরিণত না করে, তবে যন্ত্রণা, কষ্ট এসব অনুভূতি থেকে রেহাই পেতে পারেন! মনে করুন, টেলিগ্রাফ-ক্লার্ককে ছুটি দিয়ে দেওয়া হল! মোর্স-সঙ্কেত অনুবাদ করে তাকে আর দুঃখের সংবাদ জানাতে হবে না। তাহলে দুঃখ কষ্টের হাত থেকে অনেকখানি রেহাই পাওয়া যাবে নাকি?

ধরুন, কোন করুণ বর্ণনা আপনি শুনছেন। আপনি যদি সমস্ত অনুভূতিকে সেই করুণ রসের মধ্যে ভাসিয়ে দেন, তাহলে দেহের অনেকগুলি রসগ্রন্থি একসঙ্গে আক্রান্ত হবে। আপনি প্রক্ষোভাক্রান্ত হয়েছেন—একথাও বলা যাবে। চোখের ল্যাক্রিম্যাল বা ক্রন্দন-গ্রন্থি হু হু করে রসক্ষরণ শুরু করে দেবে অর্থাৎ আপনি কেঁদে ভাসিয়ে দেবেন! এড্রেনাল বা প্রক্ষোভ-গ্রন্থির অস্বাভাবিক রসপ্রবাহের জন্যে দেহের শিহরণ অনুভব করতে থাকবেন। পিটুইটরী বা বর্দ্ধন গ্রন্থি স্তম্ভিত হয়ে আপনাকে বিমূঢ় করে তুলবে। থাইমাস বা খবরদারী গ্রন্থির কাজ যাবে বেড়ে; সে সকলকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। প্যান্ক্রিয়াস ও ইনসুলিনের পাচকরস ও পুষ্টি সরবরাহে ঝাঁপ চাপা পড়বে। অসংখ্য এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির স্বাভাবিক কাজ ভয়ানকভাবে ওলটপালট হয়ে যাবে! আপনি বেসামাল

হয়ে পড়বেন ! কিন্তু যদি স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর এই অনুভূতির প্রাবল্য আপনি যথাসম্ভব দমন ফেলেন, তাহলে খুব কমসংখ্যক গ্রন্থিই আক্রান্ত হবে। আপনি দেহের স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রেখেও করুণ অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারবেন।

আচ্ছা, মনে করুন, টেলিফোনের ধারে আপনি বসে আছেন—কেউ ফোন করবে কথা আছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কখন রিং করে। আপনার সমস্ত মনোযোগ তৈরী হয়ে আছে, একটা ফোন রিং শোনবার জন্যে ! শ্রবণযন্ত্রকে তাই গোড়া থেকেই সতর্ক করে রেখেছেন। ফলে হবে কী, টুক্‌টাক্ যে কোন শব্দই শ্রবণযন্ত্রে প্রবেশ করুক্ না কেন, যেহেতু সে ফোন রিং শোনবার জন্যেই 'সুরে বাঁধা' হয়ে আছে—তাই কেবলই মনে হবে ঐ বুঝি রিং বাজল ! ক্রমাগত এমন হতে হতে খানিক পরে মন বিরক্ত হয়ে উঠবে। রোগ-শোক-দুঃখের আতঙ্কও মনকে এমনি করে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে তোলে।

অনিয়ন্ত্রিত অনুভূতি বা চেতনা আমাদের অনেক সময় বড়ই বিভ্রান্ত করে তোলে। টেবিলের ওপর পেন্সিলটা খুঁজছেন, কিছুতেই পাচ্ছেন না ! অথচ খানিক আগেও দেখেছেন। ব্যাপারটা হল কী, ঐ সময়টা আপনার মন অন্য চিন্তায় খুব ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। পেন্সিলটা টেবিলের ওপর খাতার ঠিক পাশেই পড়ে রয়েছে, আপনার চোখ 'দেখতেও' পাচ্ছে। কিন্তু 'অনুভব' করতে পারছে না, কারণ মনের কক্ষে তখন অন্য চিন্তার আধিপত্য চলছে। আবার এমনও হয় যে, আপনি যেই মশা, মাছি বা প্লেগের লক্ষপটু জীবাণুর কথা শুনলেন,

অমনি গা-হাত-পা চুলকোবার বড়ই ইচ্ছে হল ! এই সব অনিয়ন্ত্রিত অনুভূতির জন্যেই অনেক সময়ে আমরা কষ্ট পাই, অকারণে অশান্তি ভোগ করে থাকি —প্রথমে মানসিক এবং পরে শারীরিক।

সুখ-শান্তি,—এসব হল মানসিক অবস্থা। তাই দেহের ওপর থেকে মনোযোগ কমিয়ে নিয়ে মনের প্রতি যত্নবান হবার চেষ্টা করুন। আপনার মুখেই ফুটে উঠবে আপনার শান্তিময় মানসিক অবস্থার ছবি। ঘুমের সময় যখন সমস্ত মানসিক কাজকর্ম্ম মুক্তি পায়, তখন আপনার ঘুমন্ত মুখে একটা প্রশান্ত ভাব জেগে থাকবে। নির্ম্মল মানসিক শান্তি যাঁরা ভোগ করেন, ঘুমের সময় তাঁদের মুখে সর্ব্বদাই এমনি প্রশান্তি বিরাজ করে। এই শান্তি টাকা দিয়ে কেনা যায় না, পৃথিবীর কোন শক্তি দিয়ে একে জয় করা যায় না।

অটুট স্বাস্থ্য যে মনের, সে মনের সানন্দ আগ্রহ থাকে সব জিনিসে, সব কাজে। দেহের অন্যায় আব্দারকে সে আস্কারা দেয় না। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে তাই মনের উন্নতি-বিধানের কঠোর সাধনার ব্যবস্থা দেখতে পাই। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা অন্য ভাষায় একটু রকমফের করে সেই কথাকেই আবার আমাদের শোনাচ্ছেন, নাম দিয়েছেন 'সাইকোলজি'।

সকলেই হিংসুটে?

হিংসুটে কথাটার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। হিংসুটে মানুষের কথা শুনলেই বিরক্তিতে মনটা ভরে আসে। আর যদি বলি, আপনি-আমি, পৃথিবীর ছেলেবুড়ো সব ক'টি মানুষই হিংসুটে, তাহলে নিশ্চয়ই বিরক্তিটা আমার ওপরেই এসে সবটুকু পড়বে! কিন্তু কি করা যায় বলুন, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত চিন্তাশীল মানুষটি পর্য্যন্ত বলেছেন, মানুষের মনের ঈর্ষা অর্থাৎ হিংসাই আধুনিক গণতন্ত্রের মত জিনিষের জন্ম দিয়েছে। সত্যিই, এই ষষ্ঠ রিপু 'মাৎসর্য্য' মানুষের মনের মধ্যে খুবই গভীরভাবে গাঁথা, একথা অস্বীকার করা যায় না। একে বাদ দিয়ে চলা সাধারণ কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

মাটির বুকে যেদিন থেকে মানুষের বসবাস শুরু হল, সেদিন থেকেই মানুষ তার প্রতিবেশীর সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করতে শুরু করেছে। তার নিজের হাতে-গড়া ঘরবাড়ি, নিজের আকৃতি-প্রকৃতি, জীবনধারা সব কিছুই সে আপন প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করত—চেষ্টা করত তার সমকক্ষ হতে। বংশানুক্রমিক-ভাবে এই সচেতনতাই মানুষের মনে ষষ্ঠ রিপুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর পরবর্ত্তীকালে এই রিপুর বশবর্ত্তী হয়েই মানুষ তার জীবন-ধারাকে নতুনতর রূপ দেবার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে নতুন সভ্যতাকে গড়ে তোলার। সে চেষ্টার এখনো শেষ হয়নি। কথাটা প্রথম চিন্তায় হাস্যকর মনে হলেও অযৌক্তিক নয়।

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড অ্যাডলার এই রিপুটিকে এক শ্রেণীর হীনমন্যতার পর্য্যায়ে ফেলেছেন, যে হীনমন্যতা শৈশবেই আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে এবং যাকে এড়িয়ে চলা একেবারেই অসম্ভব। একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে, অন্য সবরকম প্রাণীর শিশুদের চেয়ে মানব-শিশুর শৈশবকালের মেয়াদ খুব বেশী। কারণ মানব-শিশুর দেহ অপেক্ষা মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় তাড়াতাড়ি। দেহের বৃদ্ধি ধীরে হয় বলে তার আত্মনির্ভরশীলতা অন্যান্য প্রাণীর শিশুদের চেয়ে দেরিতে আসে। এই পরনির্ভরশীলতার ফলেও মানব-শিশুর মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়।

শিশুকে যদি ঠিকমত গড়ে তোলা হয়, তাহলে এই হীনমন্যতাই তার সকল শুভ উদ্যোগের প্রেরণার উৎস হতে পারে। কিন্তু যদি তাকে ভুল বোঝা হয়, অকারণে অযৌক্তিক বাধানিষেধের ডোরে বাঁধা হয়, তার কর্ম্মক্ষমতা প্রয়োগের এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার

না—তার তুলনা করে কষ্ট পাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার উপায়টা শিখিয়ে দিতে পারেন আমাকে ?'

হ্যাঁ, পারা যায়। প্রথমেই আপনাকে গভীরতম অন্তর দিয়ে ভাবতে হবে যে, আপনি ঈর্ষা থেকে নিজেকে নিশ্চয়ই মুক্ত করতে চান। এই সঙ্কল্পের পরেই সকলের প্রতি সমস্ত রকম নালিশ-অভিযোগের কথা আপনাকে ভুলে যেতে হবে। আপনার কোনও ব্যর্থতার জন্যে কাউকে, এমন কি নিজেকেও দায়ী করা চলবে না, ধিক্কার দেওয়া চলবে না। শুধু মনে করতে হবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই আমরা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সব রকম গুণাগুণেরই অধিকারী হয়েছি। মানুষ হিসাবে শুধু আমাদের কর্ত্তব্য, মন্দ গুণগুলিকে পরিহার করে সদ্‌গুণের অনুশীলন করা।

এবারে আসুন, আর একটি সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া যাক যে, শৈশবকালে আমাদের অপরিণত মনের ওপর বাহ্য জীবন ধারার যে নিষ্ঠুর সংঘাত ঘটেছে, তারই ফলে আজ আমরা ঈর্ষাপরায়ণ। এটি নিতান্তই অনস্বীকার্য্য সত্য। আমরা দেখেছি, আমাদের মধ্যেই অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা কারো প্রশংসা শুনতে পারেন না, একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলে ওঠেন—'হ্যাঁঃ, ওর কথা আর বোলো না। ও আবার একটা মানুষ!' ইত্যাদি। অপরের প্রতি এই সামগ্রিক ও সর্ব্বজনীন ঈর্ষার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়ত 'দর্শনে'র অনেক বুলি আউড়ে নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন, শৈশবে বাপ-মা কিংবা আত্মীয়-পরিজনের অবিবেচনাপ্রসূত সমালোচনার ফলেই ভদ্রলোকের

অবচেতন মনে ঈর্ষার বিষবৃক্ষ অমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। ছেলের সামনে ছেলের নিন্দে করে মেয়েকে বা তার অন্য ভাইকে আদর করা, পাঁচজনের সামনে এক ভাইয়ের গুণকীর্ত্তন করে অপর ভাইটির নিন্দেয় পঞ্চমুখ হওয়ার যে প্রবৃত্তি আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে দেখা যায়, সেই প্রবৃত্তির ফলেই আমরা ছেলেবেলাতেই যুক্তিতর্কের কোন খাতির না রেখেই বিনাকারণে ভাই, বোন, বাবা, মা—এবং ক্রমে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মানুষের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠি। কথাটা খুবই সর্ব্বনেশে আর সাংঘাতিক সন্দেহ নেই। এবং একারণেই মনে রাখা উচিত যে, শৈশবে আমাদের একমাত্র সম্বল হল স্নেহ, ভালবাসা। যদি সেই স্নেহ, ভালবাসা থেকে আমরা শৈশবকালে বঞ্চিত হয়ে থাকি, তাহলে ঈর্ষার কবল থেকে, অসহায় মনোভাবের যন্ত্রণা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে কিছুতেই পারব না।

খুব ভাল হয়, যদি আপনি নির্জ্জন জায়গায় চুপ করে বসে স্থিরমস্তিষ্কে আপনার বিগত জীবনের কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করেন। ভাবতে চেষ্টা করুন, কোন্ কোন্ সময়ে আপনি ঈর্ষার বশবর্ত্তী হয়ে অপরের প্রতি অবিচার করেছিলেন। মনে মনে সবগুলির কারণ বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করুন। এই আত্মবিশ্লেষণের কাজ খুব সহজ নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু এইভাবে যখন আপনি ঈর্ষাপরায়ণতার উৎসের বিন্দুমাত্র সন্ধানও পাবেন, তখন দেখবেন আপনার মনে মুক্তির এক অপূর্ব্ব আনন্দ জেগে উঠেছে। এইভাবে চিন্তার একটা সদভ্যাস নিজের মধ্যে গড়ে তোলবার চেষ্টা করুন। যখনই কোন কারণে কারো প্রতি বিরূপ হবে আপনার মন, তখনই

এই ভাবে তাকে বিশ্লেষণ করতে থাকবেন। কিন্তু সাবধান, বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিজের প্রতি কোন ধিক্কার, কোন অশ্রদ্ধা যেন না আসে, নিজের সঙ্গে অপরের তুলনা করে হেয় বা শ্রেয় করবার মোহ যেন না থাকে। এই গভীর আত্মবিশ্লেষণের সাহায্যে ঈর্ষার মূল কারণ হয়ত সবক্ষেত্রে ঠিকভাবে স্মরণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু যতটুকু আঁচ পাওয়া যাবে, তা থেকেই ঈর্ষাজনিত অপকারের হাত থেকে নিজেকে এবং অপরকে সময় থাকতে বাঁচানো যাবে। এমনকি এই ধরনের গভীর ইন্ট্রোস্পেকশন বা আত্মসমীক্ষার ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে এই রিপুটিকে অনেকখানি জয় করাও অসম্ভব হবে না। গভীর বিশ্বাস এবং দৃঢ় সঙ্কল্পই আপনাকে একাজে সাহায্য করবে।

এখন একটি মহিলার জীবনকথা শুনুন। অর্থ এবং বিলাসব্যসন তাঁকে সবসময়ে ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু হলে কি হবে, মন ছিল তাঁর হিংসাভরা। সমস্ত বন্ধুর চেয়ে তাঁর ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যাদের ভাগ্য তাঁর সমান ছিল না, তা সে নিকৃষ্ট হলেও, তিনি তাদের কথা শুনে হিংসায় মরে যেতেন! তাঁর ধারণা ছিল, ওদের সুখ, ওদের অবসর সময়, আনন্দ, তাঁর চাইতে অনেক বেশী। তাঁর এই পরশ্রীকাতরতার কারণ খুঁজতে খুঁজতে তাঁর নিজের জীবনের চার বছরের বয়সে গিয়ে হাজির হলেন। সেই বয়সে তাঁদের পাড়ার কয়েকজন প্রতিবেশীর মধ্যে তাঁর সমবয়সী একটি মেয়েও ছিল তাঁর বন্ধু। একদিন হল কী, প্রতিবেশীরা এক চা-মজলিসের আয়োজন করলেন। তাতে পাড়ার সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন, কেবল করলেন না আমাদের চার বছরের এই মেয়েটিকে

ও তার বাবা-মাকে। সেই একটি দিনের ঘটনা শিশুমনের ওপর যে দাগ রেখেছিল, তার বেদনা সে আজও ভোলে নি। এই মহিলা সেই শৈশব-জীবনের বন্ধুদের নিমন্ত্রণে যাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ বড় হয়েও ভুলতে পারেন নি।

যাই হোক্, এইভাবে আত্মবিশ্লেষণ করবার পর তিনি ভাবতে লাগলেন যে, যেসব বন্ধুরা সেদিন নিমন্ত্রণে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল তারা আজকের জীবনে কে কি ভাবে জীবনযাপন করছে? খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন, ঈর্ষান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের চেয়ে অনেক সুখেই তিনি এখন দিন কাটাচ্ছেন। ইচ্ছে করলে দশ-বিশটা চা-মজলিশের আয়োজন তিনি নিজেই এখন করতে পারেন! মহিলাটির এই দৃঢ় আত্মসমীক্ষার ফলে আজ তিনি নিজের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার দুরূহ শিক্ষালাভ করেছেন, এবং এখন তিনি শিশুকল্যাণকর ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ভুললে চলবে না যে, এখনও সেই ঈর্ষার প্রভাব তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে, কিন্তু তা এখন যন্ত্রণাদায়ক স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে না, বরং সহযোগিতার প্রেরণাতেই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে প্রতিনিয়ত। অসহায় শিশুরা আজ তাঁর সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়, তিনিও বিনিময়ে পান বন্ধুত্বমূলক প্রভুত্বের অপার আনন্দ, এক কল্যাণময়ী চেতনা।

অনেক সময়ে অপর কোন একজনের জীবনের বিশেষ কোন মনোভাব জানতে পারার সঙ্গে নিজের মনের হিংসুটেপনার কলুষতা দূর হয়ে যায়। কথাটা পরিষ্কার করতে হলে একটা দৃষ্টান্ত দিতে হবে। মনে করুন, ইলা আর রাণু দুই বন্ধু। ইলার জন্মদিনে তার

দাদা তাকে কয়েকটা মাত্র চকোলেট লজেন্স দিয়েছে, আর বিকেল-বেলা চৌরঙ্গীর ধারে একটু বেড়িয়ে এনেছে। ওর বাবা নেই—আছেন বিধবা মা। খুবই গরীব—এর চেয়ে বেশী আর কি করতে পারে ওর দাদা?…তারই বন্ধু রাণুর জন্মদিনের কথা শুনুন।—রাণুর বাড়ীতে সেদিন অনেক লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, বড় বড় গাড়ী, বড় বড় লোক, ফলফুল, উপহার, মিষ্টি, আলো, বাজনা—গম্‌গম্‌ করছে। কাণ্ডকারখানা দেখে ইলা-বেচারী ভারী মুষড়ে পড়ল, বন্ধুর কাছ থেকে যেন অনেকখানি দূরে চলে গেছে সে।…যাই হোক্‌, বাড়ী যাবার সময়ে রাণুকে একলা দেখতে পেয়ে একটু দেখা করতে গেল ইলা। কথা বলতে খুবই দ্বিধা বোধ হচ্ছিল, তবুও জোর করে এগিয়ে গিয়ে একটু সৌজন্যসূচক আনন্দ প্রকাশ করল। রাণু তখন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাসভাবে বলল, 'তোরা এলি, কত আনন্দ করলুম। আজকে যদি কেকা আসত, আরো আনন্দ হত! ওরা সব কাশ্মীর বেড়াতে গেছে ছুটিতে। আর আমাদের বরাবরই কেবল পুরী যাওয়া। কাশ্মীরে যেতে আমার বড্ড ইচ্ছে করে। তোর করে না, ভাই?'

কাশ্মীর, পুরী—ও সবই ইলার কাছে ম্যাপের এক-একটি বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সে আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ী ফিরে এল, কারণ সে হঠাৎ বুঝতে পেরে গেছে যে, তার বন্ধু রাণুর আনন্দে ঈর্ষা করে কী বোকামীটাই না করেছে। সে বুঝেছে, কোন কোন বিষয়ে রাণুও তার মত দুর্ভাগা। সে আর কোনদিন বন্ধুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় নি।

ঈর্ষার যন্ত্রণার মূলোচ্ছেদ করতে হলে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বাদ

গ্রহণ করতে হবে। যদি দেখেন, কোনও বন্ধু একটি নতুন হাতঘড়ি কিনেছেন, কিংবা বিদেশ ভ্রমণের কোনও সুযোগ পেয়ে গেছেন, তাহলে হিংসা না করে চেষ্টা করুন আপনিও ঐ সৌভাগ্যের অধিকারী যাতে হতে পারেন। তখন দেখবেন, আপনার 'হিংসুটেপনা' আপনাকে শুভ-প্রেরণাই যোগাচ্ছে। বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী তো এইভাবেই আমাদের নতুন কাজে নতুন উদ্যোগে আগ্রহের সঞ্চার করে থাকেন।

মন থেকে হিংসুটেপনার কুপ্রভাব দূর করতে হলে আপনাকে হতে হবে আশাবাদী, হতে হবে আত্মবিশ্বাসী, দুঃসাহসী, সহানুভূতিশীল এবং আপনার মনকে করতে হবে কৌতূহলী ও সজাগ। ডক্টর বেরান উল্‌ফ এক ঈর্ষাজর্জ্জরিত অসহায় ভদ্রলোকের চিকিৎসা করতে গিয়ে একদিন তাঁকে কোন বড় রেলষ্টেশনে যেতে বলেছিলেন এবং সেখানকার কাউকে কোনরকমে সাহায্য করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক ষ্টেশনে ভিড়ের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক শ্রান্তক্লান্ত মহিলাকে দেখতে পেলেন। মহিলাটি তাঁর মেয়ের বাড়ীতে যেতে চান, কিন্তু মেয়ের বাড়ীর ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন। মহিলাটি খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন—সম্ভবত অসুস্থ ছিলেন ভদ্রলোকটি করলেন কী, টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে মহিলাটির মেয়ের নাম-ঠিকানা খুঁজে বার করে তাঁকে ট্যাক্সি করে সেখানে নিয়ে এলেন। শুধু তাই নয়, রাস্তায় কয়েক গোছা ফুল কিনে মহিলাটির হাতে দিলেন, যাতে তাঁর মনটা একটু ভাল থাকে। এই ভদ্রলোকটিই পরে খুব জনপ্রিয় সংগঠক হিসেবে নাম করেছিলেন। যে মহিলাটির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি নতুন জীবন

আর স্নায়বিক শক্তি খুবই ছন্নছাড়াভাবে কাজে লাগে, অর্থাৎ এ দুটির কোনটির উপকারই তাঁরা কাজে লাগাতে পারেন না।

আপনি যদি এই ধরনের ভুক্তভোগী হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় আফ্‌শোষ করে বলবেন যে, চিরকালটাই আপনার এই রকম ক্লান্তি লাগে। কিন্তু আফ্‌শোষ করবার কোন কারণই নেই। যেসব লোক ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই কোনরকম বিরক্তি বোধ না করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন, তাঁদের কথা শুনে হিংসাও করবেন না। এটা তাঁদের একটা সৌভাগ্যও নয়, কিংবা খুব উঁচুদরের ইচ্ছাশক্তিও নয়। ঘুম থেকে ওঠার ব্যাপারে এই সজীবতার পরিচয় তাঁরা দিতে পারেন, কারণ জীবনের প্রতি তাঁদের মনোভাবটাই আপনার চেয়ে পৃথক। আর জীবনের প্রতি এই বিশেষ ধরণের মনোভাবটি তাঁদের আপনা থেকে গড়ে ওঠে নি, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা এই মনোভাবটিকে আগ্রহের সঙ্গেই নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে নিয়েছেন।

আপনিও এই বিরক্তির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। সেটা খুব শক্ত কাজও নয়।

আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার না করে পারবেন না যে, ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে না চাওয়ার ফলে আপনার দিনের কাজগুলি সারতেও দেরি হয়ে যায়। এক মিনিট হোক, দু'মিনিট হোক্‌—কেন আপনি সে-কটা মিনিট নষ্ট হতে দেবেন? হতে পারে, সত্যিই হয়ত আপনি ক্লান্ত। বেশ তো, ঘুমটা যাতে গভীর হয়, যথেষ্ট হয়, তার ব্যবস্থা করেন না কেন? ঘুমুতে যাবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিন। এই সময়-নির্দ্ধারণটা খুব অবহেলার বিষয় বলে মনে করা ঠিক নয়। অনেকে বলেন যে, গভীর রাত

না হলে তাঁরা ঘুমুতে যেতে পারেন না। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, এই এমনি! কথাটা শুনেই মনে হয়, ঘুমের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলাই ঘুম-না-আসার কারণ। ছোটবেলায় পড়া "আর্লি টু বেড্, অ্যাণ্ড আর্লি টু রাইজ" ছড়াটা যাঁদের মনে আছে, তাঁদের অন্ততঃ এই অবহেলা সাজে না।

এ ব্যাপারে 'ক্লান্তি' জিনিসটাকে একটু ভাল করে বোঝা দরকার। সত্যিকারের ক্লান্তি এবং আলস্য—এ দুয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। ক্লান্তি হচ্ছে শারীরিক পরিশ্রমের পরিণাম। আর আলস্য আসে গতানুগতিক বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কাজ করার জন্যে। আলস্যকে ঘুমেরই একটা রূপান্তর বলা যায়; কিন্তু অধিকাংশ লোকই সাধারণত খুব বেশী সময়ই ঘুমিয়ে থাকেন। 'খুব বেশী সময়' বলতে হচ্ছে এই জন্যে যে, যেখানে বয়স্ক লোকের পক্ষে ৫।৬ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট, সেখানে অধিকাংশ লোকই দিনে ৮।১০ ঘণ্টা 'ঘুমিয়ে' থাকেন। তবু কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে তাঁদের অনেকেই 'আলস্যে' ঢুলতে থাকেন। বয়স বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও কমে, এই-ই সাধারণ রীতি। দিনে ছ'ঘণ্টা কেন, তার চেয়েও কম সময় ঘুমিয়ে অনেককে বেশ সক্ষম থাকতে দেখা যায়। এডিসন রাত্রে মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমুতেন, কিন্তু কারুর চেয়ে তিনি কম খাটতেন না। অনেকেই এরকম পারেন; আপনিই বা পারবেন না কেন?

এসব লোক অলৌকিক বা দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষ নন নিশ্চয়ই। আসলে কর্ত্তব্যকর্ম্মে তাঁদের উৎসাহ আছে, কাজের কথা মনে পড়লেই তাঁদের উদ্দীপনা জাগে। নতুন দিনকে তাই সাদর অভ্যর্থনা জানাতে পারেন তাঁরা, কাজ করে চলেন দিন-রাত।

কখন ঘুম ভাঙবে, কাজ শুরু করবেন—এসব চিন্তায় আপনি কি উৎসাহ পান? না কি 'আবার একটা দিন',—'সেই গতানুগতিক কার্য্যক্রম',—'দেখা-সাক্ষাৎ, টানাপোড়েন'—অবচেতন মনে এই সমস্ত কথা জেগে উঠে সমস্ত কথা জেগে উঠে সমস্ত মনটা আপনার ভরে ওঠে এক বিশ্রী অস্বস্তিতে? বোধ হয় শেষেরটা।

বেশ, তাহলে জেনে রাখুন, ঘুম থেকে উঠতে যে ক্লান্তি বোধ করেন, সে ক্লান্তি আপনার শারীরিক অবনতির লক্ষণ নয়,—আপনার অবচেতন মনেরই কারসাজি মাত্র! যখন আপনি ঘুমিয়ে থাকেন, তখন আপনার ঐ অবচেতন মনটি সচেতন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঘুম ভেঙে উঠে সচেতন মনটি কাজকর্ম্মে সজীব হয়ে উঠবে,—অবচেতন মনের তা ইচ্ছে নয়।

এই অবচেতন মন সচেতন মনের কানে কানে বলতে থাকে, "আরে ভায়া, ঘুমোও ঘুমোও। কেন ঝামেলার মধ্যে যাচ্ছ? ঘুমিয়ে থাক, ব্যস্, কিচ্ছু করতে হবে না!"—এমনিভাবেই অবচেতন মন জাগরণকে এড়িয়ে চলতে চায়।

"কাজকে এড়িয়ে চল"—এই হল অবচেতন মনের বাণী। আপনি এর হাত থেকে একেবারে নিস্তার পেতে পারবেন না কোনদিনই; এই মনটির কাছে যা ভাল লাগবে না, তাকেই সে এড়িয়ে চলতে চায়! তবে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, সে যেন আপনাকে বশীভূত করে ফেলতে না পারে। ভোরবেলা যখন অ্যালার্ম ঘড়িটা ক্রিং ক্রিং করে আপনার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করতে শুরু করল, তখনও আপনার নাক-ডাকার বিন্দুমাত্র বিরাম হল না। অবশেষে টাইমপীস বেচারা দম ফুরিয়ে থেমে গেল। আপনি তখন এক মধুর

স্বপ্নে শুনছেন যেন কোথায় বেজে চলেছে সুমিষ্ট জলতরঙ্গ বাজনা! বুঝেছেন নিশ্চয়ই, এটি আপনার অবচেতন মনেরই কারসাজি! অ্যালার্মের বিরক্তিকর শব্দকে মনভোলানো জলতরঙ্গের সঙ্গীত-লহরীতে পরিবর্ত্তিত করে সে-ই এই মধুর স্বপ্নজালের সৃষ্টি করেছে। উদ্দেশ্য এই যে, সচেতন মনকে সে জাগিয়ে তুলতে চায় না। সচেতন মন জাগলে তো অবচেতন মনের কর্ত্তৃত্বের শেষ হবে। তাই তার এই উদ্বেগ। আপনার ঘুম যদি এত কারসাজি সত্ত্বেও ভেঙে যায়, তাহলে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরেও কয়েক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবচেতন মনের আধিপত্য থেকে আপনি মুক্তি পাবেন না। ফলে তখনও সে আপনাকে তার এই 'অবাঞ্ছিত' নিদ্রাভঙ্গের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে এবং নানারকম ওজর-আপত্তির সৃষ্টি করবে আপনার মনে। আপনার মনে হবে, আপনি বড় ক্লান্ত ; মনে হবে, আর একটু গড়িয়ে নিলে বেশী দেরী হবে না ;—আরো কত কী!

আপনার কর্ত্তব্য এইখানেই শুরু হল! আপনার এই কর্মবিমুখ অবচেতন মনটিকে শেখাতে শুরু করুন যে, জীবনকে পরিপূর্ণ করতে হলে কাজ করতেই হবে, কাজ করা জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য। আপনার অবচেতন মনকে স্বপ্নজগতে কর্ম্মবিমুখ বিলাসিতার মধ্যে থাকতে না দেওয়ার দায়িত্ব আপনারই। তার স্বপ্ন-বিলাসকে ভেঙে দিন, সে যাতে আপনাকে সুপরামর্শ দিতে পারে, সেইভাবে তাকে গড়েপিটে নিন এবং এ কাজ একমাত্র আপনিই পারেন। আর কেউ না।

আপনি সেই সমস্ত দিনগুলির কথা স্মরণে আনতে চেষ্টা করুন দেখি, ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে যখন আপনার কোন বিরক্তি হয় নি!

কোনদিন হয়ত ছুটি ছিল, যাবার কথা ছিল কোথাও পিক্‌নিকে, ট্রেন ধরতে হবে। সেদিন কি আর ঘুম ভাঙতে কষ্ট হয়েছিল? হয়েছিল কি কোন কষ্ট; ভেবে দেখুন্‌ তো? কিংবা হয়ত সেদিন আপনার বাড়িতে একটি প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল; হয়ত বা নতুন চাকরিতে হাজিরা দেবার প্রথম দিনটি; কিংবা বহুদিন পরে কোন প্রিয়জন আসছে সাক্ষাৎ করতে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে আনলে বুঝবেন, আপনিও সজীব প্রাণশক্তি নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌তে পারেন অপর পাঁচজনের মতই। উদ্দীপনাময় জীবনকে আপনিও উপভোগ করতে পারেন। সেই সঙ্গে একথাও আপনার মনে হবে যে, ঘুম-জড়ানোর ভাবটা আপনার কোন রোগই নয়; এমন কি ওটি এমন কিছু একটা মারাত্মক 'বদভ্যাস'ও নয় যে, আপনি ওটিকে পরিহার করতে পারবেন না।

এই ক'টি কথা মনে রেখে, আলস্যের এই রহস্য উপলব্ধি করে, প্রতিদিনই ঘুম থেকে জেগে উঠুন। মনে করুন, প্রত্যেকটি দিনই ভারী মজার, প্রতিটি দিনই আগের দিনের চেয়ে অন্ততঃ খানিকটা অন্য ধরনের নতুন চিন্তাধারার মতই তা যেন আনন্দের খোরাক জোগায়। নতুনত্বের সন্ধান আপনি এইভাবেই পাবেন। গতানুগতিক কাজকে ভয় পাবেন না; যত ভয় পাবেন ও ততই আপনাকে দাঁত খিঁচুবে! 'কিছু একটা করছি'—এতেই মনকে খুশিতে ভরিয়ে রাখুন—তা সে যতই অ-দরকারী কাজ হোক না কেন। একটা কাজকে সম্পূর্ণ করার যে আনন্দ, সে-আনন্দ থেকে আপনার মনকে অকারণে বঞ্চিত করবেন না। দেখবেন, গতানুগতিকতার জুজু কোথায় পালিয়ে গেছে। সবই ভাল লাগছে।

আপনার কাছে যতই বিরক্তিকর মনে হোক্, আপনি যা করছেন, তা সমাজের পক্ষে খুবই দরকারী, একথা ভুলবেন না। মনে রাখবেন, আপনাকে না হলে সব কাজকর্ম্মেরই খানিকটা অংশ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নিজেকে 'অপদার্থ' মনে করবেন না। এটা একটা মারাত্মক ব্যাধি। দেখা-সাক্ষাতের সময়েই-বা নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করবেন কেন? আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে যান, দেখবেন ঐ দেখা সাক্ষাতের ফলে আপনি অন্যের ওপর আপনার চমৎকার চটপটে ব্যবহারের একটি মিষ্টি ছাপ রাখতে পেরেছেন। হয়ত এর ফলে আপনি নতুনতর কোন সুযোগ-সুবিধারও অধিকারী হয়ে যেতে পারেন। কিছুই অসম্ভব নয়, অলৌকিক নয়। কোথাও যেতে হবে? ভাবছেন, ভাঁরী টানা-পোড়েনে পড়া গেল। সারাটা রাস্তা ট্রামে-বাসে ঠায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে। দেহ ভেঙে পড়ে। কিন্তু মনটাও তা বলে কাহিল হবে? বরং ভেবে দেখুন, সহযাত্রীদের মধ্যে থেকে আপনি কত নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মনটাকে চাঙ্গা করে নিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে কত নতুন পথের সন্ধানও আপনি লাভ করতে পারেন। এগুলো কি সবই ফেল্না?

সারাদিনের কাজগুলিকে এইভাবে ভেবে দেখতে চেষ্টা করুন একবার। সব কাজেই অফুরন্ত আনন্দ খুঁজে পাবেন, অশেষ নতুনত্ব, অপরিমিত সুযোগ—যা আপনি যত তাড়াতাড়ি, যত বেশী সংগ্রহ করে নিতে পারেন, ততই আপনার ভাল। এইভাবে জীবনকে আনন্দময় করতে শিখে নিন। জানবেন, বেঁচে থাকাটাই আনন্দের।

একদিন খুব ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ুন তো! যেমন করে পারেন উঠে পড়ুন। শুনুন কান পেতে পাখির কলরব। ঊষার আলোয় তারা জেগে ওঠে, সুমধুর কণ্ঠে তারা নতুন দিনকে আহ্বান জানায়। নতুন দিনকে তারা চায়, কেন না, তারা বাঁচতেও চায়। একটু ভাবলেই দেখবেন, গতানুগতিকতা বলতে আমরা যা বুঝি, ঐ পাখিদের জীবনেও তা আছে। তবুও তারা জীবনটাকে এত আনন্দের বলে মনে করে কীভাবে?

আপনার জীবনের প্রেরণা তাই সংগ্রহ করে নিন এই ভোরের পাখির কাছ থেকে। সে যদি পারে, আপনি কেন পারবেন না ভোরবেলা খুশী হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠতে? বাঁচার মত বাঁচতে শিখুন। জাগ্রত অবস্থায় আপনি যে সমস্ত কাজ করেন, তা আগ্রহের সঙ্গে করুন। সে সমস্ত কাজ আপনার মনমত হোক আর না-ই হোক, তার মধ্যে থেকে আনন্দলাভের চেষ্টা করুন।

আরামের বিছানায় শুয়ে থাকতে কে না চায়! বিশেষ করে শীত-সকালে লেপের তলাটাই তো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শান্তিময় স্থান বলে মনে হয়। কিন্তু আপনি যখন আপনার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাবেন, তখন একটি কথা সব সময়েই আপনার মনকে সচেতন করে রাখবে যে, পশুর মত কেবল আরাম খুঁজে বেড়াবার জন্যেই সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাননি।

ভোরের আলোকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান; সে আপনার জন্যে যেসব কাজের পসরা সাজিয়ে আনছে, তার মধ্যেই আনন্দের বীজ লুকানো রয়েছে। ভোরের পাখির মতই খুশিতে মন ভরিয়ে

নিয়ে বিছানার থেকে উঠে পড়ুন—মন থেকে বিরক্তি মুছে ফেলুন। দেখবেন সব কাজে শান্তি পাচ্ছেন, সব কাজই ভারী চমৎকারভাবে করতে পারছেন, আপনার সঙ্গে কাজ করে, কথা বলে আর পাঁচজনেও শান্তি পাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে।

রসিকতা করতে হলে

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে স্বভাবতই হয়ত ভাবছেন যে, এখন দিনকাল যা খারাপ পড়েছে, তাতে রসিকতা করতে হলে একটু বুঝেসুঝে করা দরকার, নইলে সমূহ বিপদ হবে,—এই কথা বুঝি এখানে বলা হবে।

রসিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তা যে কটুরসে পরিণত হতে পারে, সে আশঙ্কা আপনি ঠিকই করেছেন। কিন্তু যদি প্রশ্ন করে বসি যে, রসিকতা যদি আপনি করতেই জানেন তবে তা বেমাত্রিক হবে কেন, তা হলে আপনাকে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে একটু বেগ পেতে হবে। কাজেই রসিকতার মাত্রা থেকেই যাত্রা সুরু করছি।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সক্রেটিসের কদাকার মুখশ্রীকে ঠাট্টা

করবার জন্যে অভিনয়ের আসরে এক কিম্ভূত-কিমাকার মুখোস গড়ে সকলকে দেখানো হচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে সক্রেটিস নিজেই উঠে এসে একেবারে মুখোশের পাশে দাঁড়িয়ে দর্শকদের ডেকে বললেন, "দেখুন তো মশাইরা, মুখোশটা ঠিক আমার মুখের মত করেই তৈরি করা হয়েছে কিনা!"

হাজার হাজার বছর আগেকার এই রসিকতার কথা মনে হলে আজও আমরা খুব আনন্দ পেয়ে থাকি। কিন্তু অন্য কোন লোক এরকম পরিস্থিতিতে এই ধরনের রসিকতা করলে আপনি তার সম্পর্কে কি ধারণা করতেন? অত বড় জ্ঞানীমানী লোক হয়েও নিজের ব্যঙ্গরূপের সামনে অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজেকে তুলে ধরে তিনি যে-রসিকতার সৃষ্টি করলেন, সে ধরনের রসিকতার পথে পা বাড়াতে সাধারণ লোকের এত কুণ্ঠা কেন? তবে কি সাধারণ লোকের চোখে সক্রেটিসের এই রসিকতা বেমাত্রিক?

মনোবিজ্ঞানীরা রসিকতাকে ব্যক্তিত্বের একটা অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁরা বলেন, ব্যক্তিত্ব জিনিসটা মানুষের আত্মা, দেহ ও মনের সব রকম বৈশিষ্ট্যের এক রহস্যময় সমন্বয়। এইসব বৈশিষ্ট্য-গুলি অসংখ্য, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয়। এদের পরস্পরের সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য সম্পর্ক রয়েছে, যা সাধারণ ধারণা বা পর্য্যবেক্ষণের বাইরে। এই রহস্যময় সম্পর্কে খবর জানবার চেষ্টা আজকের নয়। আত্ম-সমীক্ষা, গাণিতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানারকম জটিল পদ্ধতির হাতিয়ার নিয়ে এই রহস্যজাল ভেদ করবার চেষ্টার ফলে আজ পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে, তার পরিমাণ খুব বেশি বলে মনোবিজ্ঞানীরাই মানতে চান না। তবুও সেই সামান্য

তথ্য থেকেই রসিকতা সম্পর্কে তাঁরা যে সিদ্ধান্তে এসে আপাততঃ পৌঁচেছেন, তা জানলে আশ্চর্য্য হতে হয়।

যে সব সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির সম্পর্ক কতখানি, সে তথ্য জানতে গিয়ে তাঁরা যে সব সূক্ষ্ম গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়েছিলেন, তার ফলে জানা যায়, সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক আছে যে-দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, সে-দুটির একটি হচ্ছে রসিকতা (হিউমার) এবং অপরটি অন্তর্দৃষ্টি (ইনসাইট)। কান টানলে যদি মাথা আসতে পারে, তা হলে রসবোধের আলোচনা করতে গেলে অন্তর্দৃষ্টির কথা না এনে উপায় নেই।

বলতে গেলে পরিজ্ঞানই হল অন্তর্দৃষ্টি। তবে মনোবিজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত আলোচনার সময়ে আমরা এর সংজ্ঞা দেব অন্য-ভাবে। তখন বলব পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনুষ্যত্ব বা "অভিসম্বোধি" লাভ করার জন্য যে আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিধান দেওয়া হয়েছিল, তাতের "সম্যক্ দৃষ্টি" বা এই অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞানের কথা আছে।

'অন্তর্দৃষ্টি' বলতে কেবল নিজের অন্তর্দৃষ্টি (ইনসাইট)কেই বোঝায়; কিন্তু সম্যক্ দৃষ্টির গণ্ডীর মধ্যে তিনটি জিনিস পড়ে—মনের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখা, অপরের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখা বা যাচাই করা এবং চারদিকের বাস্তবকে চোখ খুলে দেখা। ব্যাপক অর্থে আমরা তাই বৌদ্ধ-পরিভাষাটিকেই গ্রহণ করব।

লর্ড চেষ্টারফিল্ড, তাঁর ছেলেকে চিঠিতে লেখেন, 'আমি নিজেকে

জানি (জেনে রেখো, এ-জানাটা সাধারণ জ্ঞান নয়)। আমি জানি আমি কি পারি না ; তাই আমি জানি আমাকে কি করতে হবে।'... ইনিও তাঁর সম্যক্ দৃষ্টিকেই কাজে লাগিয়েছেন বলতে হবে।

কিন্তু চেষ্টারফিল্ড সাহেবের মত মানুষমাত্রই তাঁর এই 'জানা'কে সাধারণ জ্ঞান বলে মনে করতে পারে না। সকলেই মনে করে, 'সম্যক্ দৃষ্টির অভাব আর যার থাকুক, আমার নেই!' এমনকি যিনি খোলাখুলি বলছেন, 'সত্যিই আমার এ দোষটা খুব খারাপ'—তিনিও যে আর একটা বড় রকমের দোষকে ঢাকা দেবার জন্যে এই নকল সম্যক্ দৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছেন না, এমন কথা বলা শক্ত।

সম্যক্ দৃষ্টির একটা বিশেষ মূল্য আছে আমাদের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর মধ্যে এর স্থান অনেক উঁচুতে। মানসিক অসুস্থতা দূর করার কাজেও এর উপকারিতা আজ সকলের কাছে সুপরিচিত। ব্যক্তিত্ব যখন ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত বা বিবর্তিত হয়ে গড়ে উঠতে থাকে, তখন এই সম্যক্ দৃষ্টি পুরনো দোষক্রটির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় নতুন পথ সৃষ্টির ব্যাপারে। আপনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি আছে এবং কি আছে বলে আপনি মনে করেন—এই দুটি তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্দ্ধারিত হবে আপনার সম্যক্ দৃষ্টি-ক্ষমতার তীক্ষ্ণতা।

এতক্ষণ সম্যক্ দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করার পর, এবার রসিকতা প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। একটা কথা বলা দরকার যে, রসিকতা আর কৌতুক এক জিনিস নয়। একজন শিশুও কৌতুক সৃষ্টি করতে পারে। মঞ্চে, কার্টুন ছবিতে, বেতারে বা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যে-সব মজার জিনিস দেখে কৌতুক অনুভব করে থাকি,

সেগুলি সাধারণত গড়ে ওঠে রকমারী বেয়াড়া, অস্বাভাবিক, অসম্ভব বা খাপছাড়া বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে। কৌতুক থেকে আপনি যে আনন্দলাভ করেন, রসিকতা থেকে ঠিক সেই জাতীয় আনন্দই আপনি পান না, জানবেন। ভাল করে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, কৌতুকের পিছনে যে জিনিসটা থাকে, একটা জিনিসকে হীন প্রমাণ করে দেখবার ও দেখাবার প্রবৃত্তিটাই যেন তার মধ্যে থাকে বেশী। কখনো বা কৌতুকের সাহায্যে মনের কোন অস্বস্তিকর আবেগের মুক্তি দেবার প্রচেষ্টাও করা হয়। কিন্তু এদের কোনটিকেই সত্যিকারের রসিকতা বলা চলবে না, কারণ এদের পিছনে সম্যক্ দৃষ্টির সচেতন অনুপ্রেরণা ও পর্য্যবেক্ষণের অভাব আছে।

সত্যিকারের রসিকতা বলতে বোঝা যায় সেই গুণটি, যার দ্বারা আপনি যা ভালবাসেন, তাকে কেন্দ্র করেই হাসির খোরাক সংগ্রহ করবেন এবং রসিকতা করার পরেও তার সঙ্গে আগের মতই ভালবাসার বন্ধন অবিচ্ছিন্ন থাকবে। এই ভালবাসার বিষয়বস্তু আপনি নিজেও হতে পারেন বা আপনার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এমন কোন জিনিসও হতে পারে। যখন নিজেকেই রসিকতার বিষয়বস্তু করে ফেলবেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার মধ্যে দ্বি-ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

এ-ধরনের রসিকতার জন্যে যে কতখানি সম্যক্ দৃষ্টি প্রয়োজন, তা আশা করি বুঝতে এখন বিশেষ অসুবিধে হবে না। শিশুর সম্যক্ দৃষ্টি নেই, তাই এ-ধরনের রসসৃষ্টিও তার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্য লোকে তাকে কি চোখে দেখে, সেটা বোঝবার মত দৃষ্টি এখনও তার

জন্মায়নি। তার আনন্দ তাই কেবল আত্মকেন্দ্রিক। সক্রেটিসের যে রসিকতাকে প্রথম চিন্তায় বেমাত্রিক বলে মনে হতে পারে, আসলে তা হল সমগ্র ব্যক্তিত্বের আদর্শ সম্যক্ দৃষ্টিরই সার্থক পরিণাম। লোকের চোখে সক্রেটিস কি এবং তিনি নিজে আসলে কি—এই দুটি তথ্যের সম্পূর্ণ জ্ঞানই তাঁকে সাহস জুগিয়েছিল অমন একটা যুগান্তকারী রসিকতার সৃষ্টি করতে!

আগেই বলা হয়েছে, কৌতুক প্রায়ই অবচেতনের প্রভাবে কোন একটা জিনিসকে হীনপ্রমাণ করে আনন্দ পায় কিংবা মনের কোন ত্রুটিকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করে। রসিকতা কিন্তু এ-চাতুরীটা করবার দরকার মনে করে না। কারণ সম্যক্ দৃষ্টির সাহায্যে সে নিজের ভালমন্দ দোষত্রুটির কথা সবই জানে; অপরকে বিদ্রূপ না করে রসিকতার তাই চেষ্টা চলে নিজের দোষগুলোকেই কিভাবে জয় করা চলে—কারণ রসিক মানুষ নিজের আত্মাকে ভালবাসে, চায় আত্মশুদ্ধি করতে, নিজেকে যাচাই করতে! আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে বাঁচানোই যে তার সম্যক্ দৃষ্টির কাজ।

তবে এ-কথাও পরিষ্কার করে বলে রাখা ভাল যে, সম্যক্ দৃষ্টি আর রসিকতার মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকলেও এবং রসিকতার পেছনে সম্যক্ দৃষ্টির পর্য্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া গেলেও, আরও একটি শক্তি এর পেছনে কাজ করে চলে,—তা হল উচ্চস্তরের বুদ্ধি। একমাত্র বিশেষ বুদ্ধিমান লোকেরাই রসিকতার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলতে পারেন। তাঁদের রসিকতা হয় সরল, স্বচ্ছ; অথচ যেখানে সাড়া জাগাবার, সেখানে গিয়ে পৌঁছয় সোজাসুজি। বুদ্ধিবৃত্তিতে যাঁরা একটু খাটো, তাঁরা যদি রসিকতা করতে যান,—

তাহলে তাঁদের অজান্তে মনের রুদ্ধ আবেগ থেকেই রসিকতার বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন করে ফেলেন, যেগুলির সামান্য বিশ্লেষণেই ব্যক্তিত্বের ত্রুটি ধরা পড়ে যায়।—তখন হতে হয় অপদস্থ! সম্যক্ দৃষ্টি একটা গতিষ্ণু প্রেরণা,—যার দক্ষতায় আবেগজাত রসিকতা অনেকখানি এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়। আপনার মধ্যে সত্যি সত্যি কোন্ অবাঞ্ছিত ত্রুটিগুলি বাসা বেঁধেছে, তা যদি আপনি জেনে সেগুলিকেই কায়দা করে রসিকতার মাধ্যমে জয় করতে চান, তাহলে আপনার বুদ্ধিবৃত্তির কতখানি নিপুণতা প্রয়োজন, আশা করি, সেকথা বুঝতে দেরী হবে না। রসিকতার সামঞ্জস্যবোধ যাকে আমরা বলি, তা হল এই বুদ্ধিবৃত্তিরই কাজ। এই সামঞ্জস্যবোধ যদি আপনার থাকে, তবেই আপনি আপনার নিজের দোষত্রুটিগুলির মধ্যে কোথায় অসামঞ্জস্য আছে, তা বুঝতে পারবেন। এবং সেগুলি নিয়ে রসিকতা করবার স্থান-কাল নির্ব্বাচনেও আপনি সফল হতে পারবেন।

আগে যেমন বলেছি যে, সম্যক্ দৃষ্টির অভাব আছে, একথা কেউ বড় একটা মানতে চায় না,—রসিকতার বেলাতেও তাই। প্রায় সকলেই, এমনকি যাঁরা বিশেষরকমের আত্মকেন্দ্রিক, তাঁরাও মনে করেন, বেশ ভালই জ্ঞান আছে তাঁদের রসিকতার! এটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বোকারা যে তিনবার হাসে, সেটাও তাই খুব স্বাভাবিক। সম্যক্ দৃষ্টির অভাব আছে বলে রসিকতার প্রকৃত রসকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছুতে বোকাদের একটু দেরীই লাগে।

এখন একটা কথা মনে হতে পারে। তা হলে কি রসিকজন মাত্রেই সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান? এ-প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমেই রসিকতার বিষয়বস্তুকে যাচাই করে দেখতে হবে যে, সেটি

আসলে কৌতুকের বিষয়বস্তু কিনা। কারণ কৌতুক সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করলেও সম্যক্ দৃষ্টির বাহবা দেবার আগে একটু ভাবতে হবে। রসিকতা যদি কোন কিছুকে হীনপ্রমাণ করতে না চায়, তবেই সেটা সত্যিকারের রসিকতা এবং এমনি রসিকতা যিনি করতে পারেন, বুঝতে হবে, তিনিই সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি।

সুসমঞ্জস রসিকতা শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গঠনে একান্ত প্রয়োজন, এ-কথা অনস্বীকার্য্য। তাই রসিকতাকে আয়ত্ত করবার একটা আগ্রহ যদি সবার থাকে তা হলে সে আগ্রহ ভাল ছাড়া মন্দ নয়। তবে সম্যক্ দৃষ্টিকেও সেই সঙ্গে বাড়িয়ে তুলতে হবে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ধ্যান, ধারণা ও অধ্যয়ন—এই যে তিনটি সাধনাকে 'সম্যক্ স্মৃতি'র পর্য্যায়ে ফেলা হয়েছিল, সেগুলি সম্যক্ দৃষ্টির পূর্ববস্তরের সাধনা। অর্থাৎ আপনি যদি সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন হতে চান, তাহলে আগে হতে হবে সম্যক্ স্মৃতিসম্পন্ন। তার সাধনা করতে হবে গভীর চিন্তা, সূক্ষ্মধারণা এবং প্রসারিত জ্ঞানচর্চ্চার মধ্যে দিয়ে। সম্যক্ দৃষ্টি নিয়ে কেউ পৃথিবীতে আসে না, কিংবা ব্যক্তিত্বই সম্যক্ দৃষ্টির জন্ম দেয় না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এই গতিষ্ণু প্রেরণার উদ্ভব হয় এবং তাকেই অবলম্বন করে গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব।

রসিকতার আর যে একটি সহায়ক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাকে গড়ে তোলা বা বাড়িয়ে তোলার সাধ্য আজও মানুষের হয়নি। ও জিনিসটা একেবারেই বনেদী। 'বুদ্ধি বাড়ছে' বলতে আমরা যা বুঝি, তা হল সহজাত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ লাভের লক্ষণ। আসলে নতুন বুদ্ধি তৈরি করা এবং পরিমিত সহজাত বুদ্ধির ওপর আরও

এক কণা নতুন বুদ্ধি যোগ করা, কোনমতেই সম্ভব নয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাই পরিমিত সহজাত বুদ্ধির চরম বিকাশ লাভই আমাদের লক্ষ্য এবং সান্ত্বনা হওয়া উচিত। অবশ্য সেখানেও মনোবিজ্ঞানীদের সতর্কবাণী স্মরণ রাখতে হবে যে, ২০।২২ বছরের আগেই বুদ্ধির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ লাভের সুচারু আয়োজন করতে হবে, তারপরে নাকি বুদ্ধি ক্রমশই 'বুড়িয়ে' যেতে থাকে। নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নানা ধরনের ছোটবড় সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে নিজের চেষ্টায় সে-গুলির সমাধান খুঁজে বার করার মধ্যেই বুদ্ধি বিকাশের একমাত্র রহস্য লুকিয়ে আছে, জানবেন। আর সেই কারণেই বোধ হয় রহস্যময়ী প্রকৃতির বিধানে কিশোর ও ও তরুণদল এতই কৌতূহলী, এতই দুঃসাহসী।

আপনি যদি আপনার ব্যক্তিত্বকে সকলের চিত্তাকর্ষক করবার ইচ্ছায় রসিকতাকে আয়ত্ত করতে চান, তা হলে জীবনের শুরু থেকেই সে-চেষ্টা করতে হবে। কারণ রসিকতাকে আপাত-দৃষ্টিতে যতটা হাল্কা বলে মনে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী সাধনা ও সংযমের দাবি তার আছে, আর তা আয়ত্ত করা সময়সাপেক্ষ।

বুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান

পৃথিবীর সব দেশেই আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধি-পরীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা দিয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি করা থেকে আরম্ভ করে বড়দের চাকরিতে নিয়োগ—সব জায়গাতেই বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে কাজেকর্ম্মে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হচ্ছে। গত মহাযুদ্ধে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরাও নিশ্চয়ই জানেন, যুদ্ধের কাজে লোকজন নির্ব্বাচনের ব্যাপারে বুদ্ধি-পরীক্ষার প্রয়োগ কতই না অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই এটি শিক্ষা সংগঠনের এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু 'বুদ্ধি' বলতে আমরা বুঝব কি? মাষ্টার মশাই হয়ত বলবেন, "মন্টু ভারী চৌকস ছেলে। তাকে যা বলি সব ক'টি কথা

সুন্দর মুখস্থ রাখতে পারে।”···এটাই কি বুদ্ধি—নাকি মণ্টুর স্মৃতিশক্তি প্রখর বললেই চলবে ?

বাড়ির গৃহিণী কর্ত্তাকে যখন বলেন, ‘এস দেখি, নিজে একটু বুদ্ধি খরচ কর না! এত কম সংসার-খরচ দিয়ে আমাকে সব কিছু চালাতে বল যে, নিজেই চেষ্টা করে দেখ না। আমি পারি না বাপু!’ গৃহিণী কি এখানে কর্ত্তার বুদ্ধির কথা বলছেন, না কেবলমাত্র সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান (কমন সেন্স)-এর কথাই উল্লেখ করতে চাইছেন ? প্রশ্ন হল, বুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে কি ?

বুদ্ধির সঠিক সংজ্ঞা খুঁজে বের করবার জন্যে অনেক পুঁথিই ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখা গেছে, কোন জায়গাতেই ‘বুদ্ধি’ জিনিসটাকে সহজ ও সন্তোষজনকভাবে অল্পকথায় বুঝিয়ে বলা হয়েছে বলে মনে হয় না। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী লিখেছেন, “সবরকম মানসিক তৎপরতার মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে থাকে, সেটাই হল ‘বুদ্ধি’।” কেউ কেউ বলেছেন, “যে কোন মানসিক তৎপরতার সঙ্গেই বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।” সত্যি কি তাই ? মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বুদ্ধি সম্পর্কে সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা আছে, কিন্তু কেউই জিনিসটাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন না।

কিন্তু আপনি বিদ্যুৎ-শক্তির কথা ভাবুন তো! আজ পর্য্যন্ত কেউ এ জিনিসটার কোন বিশেষ সংজ্ঞা দিতে পারেন নি। স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ তো সোজাসুজি বলে দিয়েছেন যে, ও জিনিসটার সংজ্ঞা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। কিন্তু যে যাই বলুন, জিনিসটা যে কি, সে সম্পর্কে আমাদের সকলেরই

ভালরকম্ ধারণা আছে! আমরা বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করতেও জানি, তাকে মাপজোখ করতেও পারি। বুদ্ধির ব্যাপারেও এই কথা। মনোবিজ্ঞানীরা এমন সমস্ত পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, যার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের কার কতখানি, কি ধরনের বুদ্ধি আছে, তা মেপেজুপে হিসেব করে বার করা খুবই সহজ হয়ে পড়েছে।

এখন আসুন, একটু গবেষণা করা যাক। একটু ভেবে দেখা যাক, যদি এমন কয়েকটি পরিবেশ নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে, যার কোনটিতে বুদ্ধিকে কাজে লাগানো যায়, কোনটিতে যায় না।

মনে করুন, স্কুলের একটি ছাত্রকে আপনি শুধোলেন, "বলত, কখন পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল?" ছাত্রটি চট্পট্ জবাব দিয়ে দিল, "১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে।"—এটা কি বুদ্ধির পরিচয়, না স্মৃতিশক্তির?... একটু আগেই বুদ্ধির এক ব্যাখ্যাকারীর কথা বলতে গিয়ে বলেছি, তাঁর মতে বুদ্ধি যে-কোন মানসিক তৎপরতার মধ্যে থাকে;—এখন দেখছি তাঁর অভিমত একেবারেই ভুল। ছেলেটি যখন পলাশী যুদ্ধের সালটি তার স্মৃতিকোণ থেকে উদ্ধার করে আপনাকে বলল, তখন নিশ্চয়ই তার মানসিক তৎপরতারই পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু সেইটাই কি 'বুদ্ধি'? মোটেই না।

আরেকটি দৃষ্টান্ত।—আপনার পোষা কুকুরটি আপনার বেড়াবার ছড়িটি মুখে নিয়ে ফিরছে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে হয়ত এমন কোনও দরজা দিয়ে তাকে যেতে হল, যেটি বেশ সঙ্কীর্ণ। কুকুর বেচারী ছড়িটি মুখে নিয়ে সেই দরজায় এসে আর ঢুকতে পারে না! তখন সে ছড়িটি মাটিতে ফেলে দিয়ে তারপর লম্বালম্বিভাবে সেটিকে টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। এতে কি বুদ্ধির পরিচয় পেলেন

কিছু: হ্যাঁ, মনে হয়, এখানে কুকুরটি তার বুদ্ধিরই পরিচয় দিতে পেরেছে। সে বেকায়দায় পড়ে তার মাথা খেলাতে পেরেছে। কুকুরটি যদি এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ছড়িটিকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে, ঠোক্কর খেয়ে, হোঁচট খেয়ে বহু কষ্টে দরজা পেরুতে পারত, তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন না যে, কুকুরটার বুদ্ধি আছে। বলতেন কি?

মনে করা যাক, একপাল ভেড়া ছুটোপাটি করে একটা সরু পথ ধরে চলেছে। পথের পাশ থেকে একজন লোক মজা দেখবার জন্যে একটা লাঠি নিয়ে ওদের চলার পথে আগিয়ে ধরল মাটি থেকে ইঞ্চি চারেক উঁচুতে। সবচেয়ে আগে যে ভেড়াটি যাচ্ছিল, সে লাঠিটি ডিঙিয়ে চলে গেল। তারপর লাঠিটা সরিয়ে নেওয়া হল। দেখা যাবে, প্রত্যেকটি ভেড়াই ওই এক জায়গায় অকারণে একটা করে লাফ দিয়ে আবার চলতে থাকছে! ব্যাপারটা নিছক অনুকরণই বলতে হবে। যদি বলি, ভেড়াগুলোর বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নেই, আপনি নিশ্চয় বলবেন, "যা বলেছেন। একেবারে ভেড়া।"... সত্যিই, এখানে বুদ্ধির অভাব দেখা গেল।

বলতে পারেন, একটি পাখি কোনরকম শিক্ষা না পেয়েই তার বাপ-মা যেভাবে বাসা বাঁধত ঠিক তেমনটি করেই বাসা বাঁধার কায়দাটা আয়ত্তে আনে কিভাবে? আপনি বলবেন "ওতো ওদের সহজাত প্রবৃত্তি।" কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি কাকে বলে? জিনিসটাকে একটু ব্যাখ্যা করে দেখতে পারেন? নিশ্চয়ই একে আপনি তখন 'বুদ্ধি' বলবেন না।

সার্কাসের খেলায় ঘোড়া, বানর, ভাল্লুক, কুকুর আরো অনেকরকম

জন্তুজানোয়ারকেই আমরা আশ্চর্য্যরকমের খেলা দেখাতে দেখেছি। যাঁরা এই সব জন্তুজানোয়ারদের খেলা শেখান, তাঁরা বলেন যে, এগুলো কেবলই অভ্যাসের ব্যাপার, যার ফলে তারা একদিন না একদিন সফলতার পুরস্কারস্বরূপ এই খেলাগুলো আয়ত্ত করে ফেলতে পারে। এইসব শিক্ষকরা তাই বলেন যে, জন্তুজানোয়াররা খেলা শিখতে না পারলে তাদের কোনও শাস্তি দেওয়াটা ঠিক নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, কোন কিছু পুরস্কারের লোভে শিক্ষকের নির্দ্দেশ পালন করার মধ্যেও কি আমরা জন্তুজানোয়ারদের বুদ্ধির পরিচয় পাই না? স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, কিসের প্রেরণায় তারা শিক্ষকের নির্দ্দেশ অনুসরণ করতে পারে, বুঝতে পারে?

মনে হয়, এই বিষয়টি থেকেই আমরা সমস্ত রহস্যের মূল উদ্ঘাটন করতে পারব। একজন বিজ্ঞানী একটি ঘরের ছাদের কড়িকাঠ থেকে একছড়া কলা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ঘরে কয়েকটি চ্যাপ্টা বাক্স এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। ঘরের মধ্যে আর কোন জিনিসপত্র ছিল না। এই রকম একটা ঘরের মধ্যে বিজ্ঞানী একটা শিম্পাঞ্জীকে ছেড়ে দিলেন; ইচ্ছাটা এই যে, জন্তুটা কি করে সেটা দেখবেন!

শিম্পাজীর নজর পড়ল প্রথমেই ঐ কলার ছড়াটির দিকে! মারল লাফ ওটিকে পাবার আশায়! কিন্তু বেচারী বারবারই বিফল হল। অতঃপর ঘরের মধ্যে যে বাক্সগুলি ছড়িয়ে পড়ে ছিল, তার একটিকে টেনে এনে ঠিক কলার ছড়াটির নীচে রেখে তার ওপর দাঁড়িয়ে আবার ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করল এবারেও বেচারীকে হতাশ হতে হল।

তারপর সে আর-একটি বাক্স এনে আগের বাক্সটির ওপর চাপিয়ে মারল লাফ। এবারে সে তার ঈপ্সিত ফলগুচ্ছ লাভ করে ধরায় অবতীর্ণ হল! এখন এই ঘটনাটি থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি?

শিম্পাঞ্জীটি তার উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছে এই অসুবিধাজনক অবস্থায় জয়ী হবার জন্যে। কিংবা একথাও বলতে পারি যে, পশুটি অবরোহ প্রণালীতে নিজের বিচার শক্তির খানিকটা প্রয়োগ করেছে। "যদি একটা বাক্স এখানে বসানো যায়, তাহলে……" চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হল কাজ! হয়ত একথাও সে ভেবে থাকতে পারে, "আর একটা বাক্স চড়ালে কলার ছড়াটার নাগাল পেতে পারি!"……

যাই হোক, যেভাবেই আপনি 'বুদ্ধি' জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করুন না কেন, আপনাকে নিশ্চয়ই একথাও বলতে হবে যে, 'নতুন কোন পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারার ক্ষমতাটাও বুদ্ধি' বটে! এটা ঠিক কোন বিশেষ ধরনের নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান বা শিক্ষা বা স্মৃতি শক্তিও নয়। বুদ্ধির মধ্যে এজিনিসগুলির অল্পবিস্তর অংশ থাকতেও পারে; কিন্তু গোড়ার কথাই হল এই যে, এটা এক ধরনের ক্ষমতা, যার দ্বারা কোনও পূর্ব্বার্জ্জিত পুরানো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে নতুন কোন পরিস্থিতি, বিশেষ করে আরও বেশী সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো যায়।

এই বুদ্ধি আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে প্রেরণা, এনে দেয় দূরদৃষ্টি, নূতনত্ব, সৃজনক্ষমতা, আর বিচার শক্তি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এর দ্বারা আমরা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বা কমন-সেন্সকেই

বুঝব, যে কাণ্ডজ্ঞানের কথা নিয়ে গৃহিণী কর্ত্তাকে মুখনাড়া দিয়ে থাকেন, সংসার খরচের স্বল্পতার জন্যে! শুধুই সহজ সাদাসিধে 'কমন সেন্স'! যদিও বলা হল 'কমন', কিন্তু কার্য্যতঃ পৃথিবীতে এই জিনিসটাই বোধ হয় সবচেয়ে 'আনকমন' অর্থাৎ অসাধারণ বা আশ্চর্য্য—যাই বলুন!

স্মৃতি থেকে বিস্মৃতি

মনে করুন, এক বন্ধু আপনার কাছে একখানি বই চেয়ে চেয়ে হয়রান; আপনি কেবলই বইখানি দেবার কথা ভুলে যাচ্ছেন! বন্ধুটি যতই অপবাদ দেন যে, আপনার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ততই আপনি ঘোর আপত্তি করে বলেন, না, স্মৃতিশক্তি ঠিকই আছে, তবে পাঁচ-ঝঞ্ঝাটে ঠিক খেয়াল রাখতে পারেন নি!

কিন্তু কথা হল এই যে, স্মৃতিশক্তি যদি আপনার ঠিকই থাকবে, তবে খেয়াল রাখতে না পারার কারণ কি হতে পারে? তাহলে কি কোন কিছু খেয়াল রাখতে না পারাটা আপনার স্মৃতিশক্তির অভাব বলে মনে করা চলবে না? কিন্তু সেটাও তো আবার প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মিলবে না। ব্যাপারটাকে তাই একটু অন্যভাবে

বোঝবার চেষ্টা করা দরকার। কারণ কেবল আপনি আমি নয়, অধিকাংশ লোকই নিজের স্মৃতিশক্তির অভাব হয়েছে, একথাটা সহজে মানতে চান না, অথচ আপনিও হামেশাই নানা কাজ, নানা কথা বেমালুম ভুলে যান।

ধরুন, ওপরে যে বন্ধুটির কথা বলা হয়েছে, তিনি আপনার কাছে রোজ বইখানা চাওয়া সত্ত্বেও না পেয়ে একদিন আপনার বাড়িতেই এসে হাজির। এ-কথা সে-কথার পর বইখানির কথা উঠল। আপনি বইখানা আনবার জন্যে উঠে এলেন ওপরতলায়। যেখানে বইখানি আছে, সেখানে গিয়ে কিন্তু একটা অদ্ভুত মুশকিলে পড়ে গেলেন,—কিজন্যে ওপরতলায় এলেন, সেটাই গেছেন ভুলে! অনেক মাথা চুলকোলেন, কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে নেমে এলেন। কিন্তু, কী আশ্চর্য্য! যেমনি আপনি বন্ধুটির সামনে এলেন, অমনি ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল যে, বইখানা আনবার জন্যেই ওপর যেতে হয়েছিল। চললেন আবার!

এখন একটু ভাল করে ভাবা দরকার যে, স্মৃতিশক্তির অভাবই যদি ভুলে যাওয়ার কারণ হবে, তাহলে বন্ধুটির কাছে যেই নেমে এলেন, অমনি আবার বইয়ের কথাটা মনে পড়ে গেল কেন? স্মৃতিশক্তির অভাবটা কি তাহলে এতই সাময়িক, এতই আনুষঙ্গিক?

স্মৃতিশক্তি বস্তুটি কি, এ নিয়ে যত আলোচনা গবেষণা হয়েছে, তা থেকে মোটামুটি এই কথাই বোঝা যায় যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতা ও চিন্তাগুলির পরস্পরের মধ্যে এক-একটা বিশেষ ধরনের সংযোগ বা অনুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন) সৃষ্টি

করে আমরা মনের মধ্যে মজুত করে রাখি। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা যাক।

আপনি একখানা চিঠি পকেটে ভরে রাস্তায় বেরুলেন; ইচ্ছেটা এই যে, একটা ডাকবাক্স চোখে পড়লে চিঠিখানা 'ডাকে' দেবেন। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনের মধ্যে আপনি চিঠিখানির সঙ্গে ডাকবাক্সের একটা 'অনুষঙ্গ' স্থাপন করে ফেললেন। যদি অনুষঙ্গটা পাকাপাকি হয়ে থাকে, তাহলে রাস্তায় বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলতে থাকলেও ঠিক ডাকবাক্সের সামনে এসে আপনার হাতখানি পকেটের মধ্যে ঢুকে গিয়ে চিঠিখানি টেনে আনবে, এবং 'ডাকে' দেবে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে যত কিছু মনে রাখার কাজ আমরা এইভাবে অনুষঙ্গ-পদ্ধতিতেই করে থাকি। আর বোধ হয় এই জন্যেই কোন কিছু খেয়াল রাখতে হলে কাপড়ের বা রুমালের কোণে গিঁট দেওয়ার রীতিটা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষই এখনো মেনে চলে, কেবল কয়েকজন 'অতিআধুনিক' ছাড়া!

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, যে-বন্ধুটির তাগিদে বই আনবার জন্যে ওপরতলায় গিয়ে বইয়ের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন, সেই বন্ধুটির সামনে এসে আবার বইয়ের কথা মনে পড়বার পেছনেও আছে এই 'অনুষঙ্গ'-রহস্য।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে বইখানির কথা ভুলে যাওয়ার পেছনে কি রহস্য আছে? সেটাও কি অনুষঙ্গের কারসাজি? না, অনুষঙ্গের ব্যর্থতা? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই আমরা এবার আসল কথায় আসব।

মনঃসমীক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা যায় যে, ভুলে যাওয়াটা স্মৃতিশক্তির অভাব তো মোটেই নয়, বরং তাকে সমগ্র স্মৃতিশক্তিপুঞ্জের মধ্যেই এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের প্রতিকূল অনুষঙ্গ বা সংঘর্ষ বলা চলে। আসল ব্যাপারটা হল, আপনি বন্ধুটিকে বইখানি দিতে মোটেই ইচ্ছুক নন; কারণ অন্য একটি বন্ধু ইতিপূর্ব্বে আপনার একখানি বই নিয়ে মলাট-ছেঁড়া অবস্থায় ফেরত দিয়েছেন। তাই এঁকেও এখন আর বই দেবেন না; কিন্তু একথাটা বন্ধুত্বের খাতিরে বলতেও পারছেন না। 'বই দিতে পারব না'—এই কথাটা বিশেষ যত্নের সঙ্গে আপনি অবদমন (রিপ্রেস) করবার চেষ্টা করছেন আপনার অজান্তেই। বন্ধুটিকে যখন দেখছেন, তখনই মাত্র আপনার মনে পড়েছে বইয়ের কথা; যখন বন্ধুটির প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গ পাচ্ছেন না, তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে পুরনো অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ— 'মলাট-ছেঁড়া বই' + 'আর কাউকে বই দেব না'। স্মৃতিশক্তির সত্যিকারের অভাব যদি আপনার হত, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি এই পুরনো অভিজ্ঞতার সহায়তা লাভ করতে পারতেন না। এখন তাহলে বলতে পারি যে, সত্যিই, ভুলে যাওয়ার পেছনেও কাজ করছে আপনার সজাগ স্মৃতিশক্তি আপনার অজান্তেই, তবে সম্পূর্ণ প্রতিকূল উদ্দেশ্য নিয়ে!

কথাটা শুনে অনেকেই 'কিন্তু কিন্তু' করবেন সন্দেহ নেই। কেন না, ভুলে যাওয়াটা যে স্মৃতিশক্তি বা মনে রাখারই আর এক দুষ্টুমি, একথাটা যেমন বেয়াড়া, তেমনই অবিশ্বাসযোগ্য মনে হবারই কথা; বিশেষ করে, কথাটাকে মানতে হলে আত্মসম্মানে ঘা লাগবার সম্ভাবনা আছে খুবই। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে, আপনার অবচেতনের

সুপ্ত স্মৃতি যখন বর্ত্তমানের কোন কাজে আপনার অজান্তেই বাধা দেবার চেষ্টা করে এবং সফল হয়, তখনই আপনি ভুলে যান। যখন আপনি অতীতের কোন স্মৃতিকে সজাগ ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সচেতন স্তরে এনে তার সহায়তায় বর্ত্তমানের কোন কাজকে সরিয়ে রাখতে চান, তখন কিন্তু তাকে আমরা 'ভুল' বলি না। তখন খোলাখুলি-ভাবেই অভিজ্ঞতার 'রেফারেন্স' দিয়ে প্রাণ হাল্কা করে ফেলি।

বন্ধুটিকে যদি আপনি মিষ্টি কথায় বলতেন, 'দেখ ভাই, অনেকে আমার বই নিয়ে ক্ষতি করে দিয়েছে, তাই আর কাউকে আমি বই-পত্তর দিই না'—তাহলে ভোলাভুলির হাত থেকে এবং স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার অপবাদ থেকে অন্ততঃ বাঁচতে পারতেন। তবে একথা স্বীকার করি যে, বন্ধুটি দুনিয়াময় আপনার অসহযোগিতার দুর্নাম রটনা করে বেড়াত। এইভাবে দুর্নাম রটে গিয়ে বন্ধুমহলে অপ্রিয় হবার সখ আর কার হয় বলুন? আপনিও যে সে-বিষয়ে সতর্ক হবেন, সেটা তো স্বাভাবিক। তাই আপনি তিক্ত সত্যকে করলেন 'অবদমন', অর্থাৎ করলেন মুখে না আনবার চেষ্টা; দিলেন তাকে পাঠিয়ে অবচেতনের পাতাল-গহ্বরে। যখনই বই দেবার কথা সচেতন স্তরে আপনি আনবার চেষ্টা করেন, অমনি পাতাল-গহ্বরের সেই পুরনো বন্দী শুরু করে দেয় তার সঙ্গে ঝটাপটি! সচেতন স্তরের শিশু-চিন্তা তার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? সে হয়ে পড়ে কাৎ। আপনি বলেন, 'স্যরি, ভুলে গেছি!'

তাই জানবেন, ভুলে যাওয়ার পেছনে অবদমনের প্রতিক্রিয়াটাই চলে বেশী। আপনি যত অবদমনের দিকে ঝুঁকবেন, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে যতই নানা চিন্তাকে প্রকাশলাভে বঞ্চিত

করবেন, ততই আপনার ভুল হবে। অথচ বর্ত্তমান সামাজিক অগ্রগতির যুগে যখন চোদ্দ রকমের কাজ ও চিন্তা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে হয়, তখন একটি কাজ বা চিন্তার সময়ে অন্যগুলিকে অবদমিত না রেখে উপায় কি বলুন? অন্যভাবে বলতে পারি যে, মানুষের অগ্রগতির জটিলতাই তার মনের অস্বাভাবিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শিশু-মনোবিজ্ঞানীদেরও ধারণা, শিশুর ওপর বড়দের শাসন ও নিষেধের বহর যত বাড়বে, তার স্মৃতিশক্তির বিকাশ হবে তত কম। অর্থাৎ তার মানসিক কর্ম্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে অবদমিত চিন্তা ও রুদ্ধ আবেগের পরিমাণ এত বেড়ে যাবে যে, সেগুলির দুর্দ্দম প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে অন্য সব কাজে; শিশুর পড়াশুনা, কাজকর্ম্ম সব ব্যাপারে হবে ভুল, আর আমরা মনে করব সে বড় একগুঁয়ে অথবা বেজায় বোকা।

ভুলের শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, ভুল মোটামুটি দু'রকমের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভুল, যাকে বলতে পারি 'বেমালুম ভুল' অর্থাৎ কথাটা যেন মন থেকে একেবারেই উঠে গেছে! যেমন, বই আনার কথা ভুলে যাওয়া। এ ধরনের ভুল ভারী বিরক্তির সৃষ্টি করে। এবং জানবেন, অবদমিত চিন্তা যখন অত্যন্ত তীব্র হবে, তখনই সে এমনি ভাবে সচেতন চিন্তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে!

আর এক ধরনের ভুল, যা প্রায়ই আমাদের মধ্যে কৌতুকের সৃষ্টি করে থাকে, তা হল 'বিকৃত ভুল'। অর্থাৎ আসল জিনিসটাকে লুকিয়ে রেখে অন্য আজেবাজে কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে এবং

'নিখিল',—তার সঙ্গে ছিল ভয়ানক শত্রুতা। আর একটু বড় হয়ে 'প্রবীর' ও 'কার্ত্তিক' নামে দুই ডানপিটে ছেলের সঙ্গে তাঁর ভাব জমে। এবং এই দুই নতুন বন্ধুর সহায়তায় প্রায়ই তিনি পুরনো বন্ধু 'নিখিলে'র শত্রুতার প্রতিশোধ নিতেন।···এইভাবে মনঃসমীক্ষার পর তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, 'নিখিল' নামটির সঙ্গে তাঁর যে প্রতিকূল অনুষঙ্গ গড়ে উঠেছে, তার সূত্র ধরেই 'অখিল' নামটাকে তিনি ভুলতে চান। আবার তারই সূত্রে মনে আসে 'সুবীর' আর 'কার্ত্তিক' নাম দু'টি। তবে 'প্রবীর' নামটি হয়ে গেছে সামান্য বিকৃত। আর 'নিখিল' কথাটিও বিকৃত রূপ নিয়ে একবার উঁকি মেরেছে 'অনুকূল' হয়ে।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমাদের সমস্ত ভুলকেই এইভাবে বিশ্লেষণ করলে অনেক আশ্চর্য্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যখনই কোন ভুল করবেন অমনি একটু নিরিবিলি জায়গায় স্থির হয়ে ভুলের কথাটি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকবেন। ঐ সূত্রে অনেক আজে-বাজে অর্থহীন কথা মনে আসবে, বাছবিচার না করে সমস্ত লিখে যাবেন এক টুকরো কাগজে। তারপর ঐ আজেবাজে কথাগুলির এক-একটিকে নিয়ে আগের মতই আবার গভীর চিন্তা করুন, আরো কিছু মনে আনতে পারেন কিনা। একদিনে না হয়, পর পর কয়েক দিন একই সময়ে একই জায়গায় ঐভাবে চেষ্টা করুন। যে ফলাফল পাবেন, তাতে আপনি নিজেই আশ্চর্য্য না হয়ে পারবেন না।

স্নেহ আর ঘৃণা

খুকু তার রঙচঙে পুতুলটাকে নিয়ে খুব মেতে আছে। তাকে জামা পরাচ্ছে, গয়না পরাচ্ছে, আদর-যত্নের আর সীমা! কিন্তু আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই পুতুল ঘরের মধ্যে তুমুল কাণ্ড! কী, না খুকুর রাগ হয়েছে পুতুলমণির ওপর; আর রাগে বেদম প্রহার করছে বেচারীকে! পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন বাবা। কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি একটু মুচকি হেসে বলে গেলেন, "ছেলেমানুষদের মনটাই অমন! এই ভাব, এই আড়ি!" সত্যিই তো, ব্যাপারটাকে নিতান্তই ছেলেমানুষি ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে?

বিকেলবেলা বাবা বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। খুকু কি যেন একটা বায়না নিয়ে খুব ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছিল বলে দিলেন কষিয়ে দুই

থাবড়া,—খুকু কেঁদে ভাসাল মায়ের বুক। তার চোখের জল শুকোতে না শুকোতেই বাবার মনটা কেমন যেন করে উঠল ঃ "আহা, কচি মেয়েটাকে মারাটা ঠিক হয়নি।" খুকুকে কোলে জাপটে ধরে তার কোঁকড়া চুলে আঙুল চালিয়ে আদর করেন, নিজের প্লেট থেকে দুখানা বিস্কুট তুলে তার হাতে গুঁজে দেন।

পুতুল-ঘরে খুকু পুতুলের ওপর আগে আদর, পরক্ষণেই রাগ দেখিয়েছিল। আর তার বাবা দেখালেন আগে রাগ, সঙ্গে সঙ্গেই আদর। কেবলমাত্র স্থান পরিবর্ত্তন ছাড়া দুটি প্রক্ষোভেরই সান্নিধ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান বলতে পারি। অবশ্য বাবার বেলায় ছেলেমানুষির উপমা দেওয়াটা নিতান্তই গর্হিত হবে বলে ওটা থেকে বিরত হওয়া গেল!

কিন্তু একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন তো, এই 'ছেলেমানুষি' আমাদের সকলের মধ্যেই আছে কিনা? আপনার আমার বাল্যাবস্থার অবসান হয়েছে, তাই এ ধরনের একটা মন্তব্য এড়িয়ে চলার স্বভাবটাই স্বাভাবিক। তবে মনের বিজ্ঞানী যাঁরা, মনের অন্ধিসন্ধির খবর রাখা যাঁদের কারবার, তাঁরা বলছেন যে, মানুষের মনেই ঐ আদর আর রাগ, ঐ স্নেহ আর ঘৃণার দুটি বিপরীতধর্ম্মী স্বভাব একই সঙ্গে কাজ করে চলেছে। কথাটা বড়ই অদ্ভুত, বড়ই বেখাপ্পা মনে হলেও ভিত্তিহীন নয়। আসলে একটার তীব্রতা অপরটির চেয়ে বেশী হলেই তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে। এই বেয়াড়া স্বভাবের অধিকারী আপনি-আমি সকলেই এবং দৈনন্দিন জীবনে এটাকে মোটেই অস্বাভাবিকতার লক্ষণ বলে আমরা মনে করি না।

'ছোট্ট দাদা' যখন তার নতুন বোনটিকে আদর করে এবং

পরক্ষণেই কি জানি কেন, কিল মেরে কাঁদিয়ে দেয়; কিংবা যে শিশুর সমস্ত স্নেহ, আদর মাকে ঘিরে গড়ে ওঠে, সেই শিশুই যখন হঠাৎ মাকে দমাদম্ কিল মারে, চুল টেনে দেয়,—তখন আমরা বেশ বুঝতে পারি যে, আমাদের সকলের মধ্যেই স্নেহ আর ঘৃণা—এই দুটি শক্তিশালী মানসিক বৃত্তি জন্মের সূচনা থেকেই নিহিত আছে। মনোবৈজ্ঞানিক ভাষায় একটিকে বলি লিবিডো, আর অপরটিকে বলি মরটিডো। যদি অনুমতি দেন তো এ দুটি নামের দুটি বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে আমাদের আলোচনাটিকে সহজ করবার চেষ্টা করি। ধরুন, প্রথমটিকে বলা যাক—জীবনবৃত্তি, আর দ্বিতীয়টি মরণবৃত্তি।

আমরা যা কিছু গড়ে তুলি, সৃষ্টি করি, সে সবের পেছনে আছে ঐ জীবনবৃত্তি বা লিবিডো। যাঁরা সিগ্‌ম্যণ্ড ফ্রয়েডের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, তাঁর মতে মানুষের যৌনজীবন ও সন্তান উৎপাদনের ভিত্তিও নাকি এই লিবিডো।

প্রথম দৃষ্টিতে মরণবৃত্তি বা মরটিডোকে অবাঞ্ছিত বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু জানলে আশ্বস্ত হবেন যে, ঐ মরণবৃত্তিই আপনাকে করে তোলে আক্রমণাত্মক, যখন আপনি হন বিপন্ন। বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এই মরণরবৃত্তিই তো আপনাকে মরিয়া করে তোলে। জীবন সংগ্রামে আপনি প্রতিপদেই হোঁচট খাবেন, যদি আপনার মধ্যে আক্রমণের প্রবৃত্তি একটুও না থাকে।

একটু বিরক্ত হলেন বোধ হয়। ভাবছেন, "ওই তো আমাদের শতদলবাবু, কেমন মিষ্টি মানুষটি। ওঁর মধ্যে মরণবৃত্তি আছে, অপরকে আক্রমণ করবার প্রবৃত্তি আছে—একথা বলা ভারী অন্যায়।" তাহলে ব্যাপারটা একটু খোলসা করেই বলা যাক।

শিশুদের মধ্যে 'এই আড়ি—এই ভাব' প্রবৃত্তিটা স্পষ্ট বোঝা যায়, কারণ তাদের বিবেক তখনও জাগ্রত হয়নি, একটু আগেই এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছি। অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শিশুদের এই দুটি শক্তিই সমান তেজী থাকে এবং যেটি যখন সুযোগ পায়, কেরামতি দেখিয়ে নেয় ভাল-মন্দ ফলাফলের কথা না ভেবেই। আমরা যতই বড় হতে থাকি এবং আমাদের বিবেক যতই জাগ্রত হতে থাকে, ততই বুঝতে পারি যে, যখন খুশি ইচ্ছে হলেই একজনের পিঠে কিল কষিয়ে দিলে ফল ভাল হয় না। তখন আমরা সেই ইচ্ছাকে অন্য পথে চালিত করি। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, শতদলবাবু এই কাজটা বেশ কড়া হাতেই করতে পেরেছেন। আপনি-আমি সকলেই অল্পস্বল্প সেটা পারি।

আমাদের কোন কিছু ভাল-লাগা বা না-লাগার মূলেও এই দুই শক্তির রহস্যময় ক্রিয়া চলতে থাকে। যদি আপনাকে প্রশ্ন করি "আচ্ছা, আপনি সন্তোষবাবুকে দেখলেই অমন অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন কেন?" তাহলেই হয়ত আপনি হাত পা নেড়ে মাথা চেলে সন্তোষ-বাবুর নামে যত সব আজগুবি নালিশ করতে আরম্ভ করে দেবেন। আপনাকে যতই যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিই যে, না, আপনার নালিশগুলোর কোন ভিত্তি নেই—তবুও আপনি টেবিল চাপড়ে বলে উঠবেন, 'ও যাই বলুন মশায়, ও লোকটাকে দেখলেই আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।'

যখন 'হাড়পিত্তি জ্বলে যাওয়ার' পেছনে কোন যুক্তি থাকে না, তখন বলতে পারি যে, আপনি আপনার মরণবৃত্তিকে ঠিকমত বাগে আনতে পারেন নি। আগেই বলেছি, মরণবৃত্তি হচ্ছে আক্রমণাত্মক।

এই বৃত্তিকে সাবধানতার সঙ্গে ঠিক কাজে লাগাতে না পারলে সে বিকৃতপথে আত্মপ্রকাশ করবেই করবে। যখন আপনি যুক্তিতর্ক দিয়ে কোন জিনিস বা লোকের দোষগুণ বর্ণনা করছেন, তখন আপনি মরণবৃত্তির প্রেরণাতেই সে কাজ করেছেন, একথা ভুলবেন না ; কিন্তু তখন আপনি সমালোচক—আপনি বাঞ্ছনীয়। আর, যদি মরণবৃত্তিকে কারণে-অকারণে গলা টিপে শুইয়ে রাখতে চান, তাহলে সে তো থাকবেই না, বরং কোন অসতর্ক মূহূর্ত্তে অন্যায়ভাবে কোন নিরীহ মানুষের ঘাড়ে চেপে বসবে। আপনি হবেন তখন 'নিন্দুক'।

কেমন করে নিরীহ মানুষের সঙ্গে আপনার আকস্মিক অন্যায় অনুষঙ্গ (অ্যাসোসিয়েশন) ঘটে যায়, সেকথা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বাইরে। তবে মোটামুটি বলা যেতে পারে যে, আমাদের মধ্যে-যেসব দোষ থাকাটা আমরা পছন্দ করি না, অথচ আছে বলে মনে মনে জানি, সেগুলোকে তাড়াবার জন্যে নিজের মরণবৃত্তিকে কাজে লাগাই। কিন্তু বেচারী কি করবে বলুন, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আর এক শক্তিশালী 'অহম্'ভাব রয়েছে, তার সঙ্গে পেরে ওঠা তো আর সহজ নয়! 'আমি ভাল'—এই মনোভাবের কাছে মরণবৃত্তি যখন আর্জি পেশ করতে যাবে, তখন যে একটা ভয়ানক গুঁতো খাবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? 'অহম্'-এর এই গুঁতো খেয়ে মরণবৃত্তি বেচারী তখন খুঁজে বেড়াবে, তার মনের ঝালটা কার ওপর ঝাড়া যায়। যেসব দোষের নিন্দে করবার জন্যে সে তৈরী হয়েছিল, সেইসব দোষের কণামাত্র আর যার মধ্যেই খুঁজে পাবে, তার বিরুদ্ধেই ভয়ানক বিষোদ্গার শুরু করে দেবে। কিন্তু যেহেতু পেছনে 'অহম্'-এর দাবড়ানি আছে এবং অহমের মর্য্যাদায় ঘা লাগলে আবার

দাবড়ানি খাবার আশঙ্কা আছে, তাই বিষোদ্গারের যুক্তিগুলি হবে খুব কাঁচা, খুব হাল্কা। আমরা অনেক সময় দেশের নেতাদের সমালোচনা করতে গিয়ে একজনকে অকারণে স্বর্গের চূড়োয় বসাবার চেষ্টা করি, আর অন্যজনকে অবলীলাক্রমে পাতালে নামিয়ে দিই। তার পেছনেও জানবেন আছে মরণবৃত্তির এমনিতর বিকৃত তৃপ্তি।

এই মরণবৃত্তি কখনও বহির্মুখী, কখনও বা অন্তর্মুখীও হয়ে থাকে। যখন বহির্মুখী মরণবৃত্তি মারাত্মক রকম তীব্রতা লাভ করে, তখন দেহের প্রতিটি স্নায়ুতে জেগে ওঠে বাইরের জগতের সব কিছু ধ্বংসের অদম্য বীভৎস ইচ্ছা। এমনি অবস্থায় মানুষ খুনজখম পর্য্যন্তও করতে পারে। তাই খুনে-ডাকাতদের মরণবৃত্তি মারাত্মক রকমের তীব্র এবং বহির্মুখী হয়ে থাকে। আবার যদি এই বৃত্তি হয়ে পড়ে অন্তর্মুখী এবং অস্বাভাবিক রকমের তেজী, তাহলে ঘটে যায় আত্মহত্যা। আত্মঘাতী এবং খুনী—উভয়ের মানসিক অস্থৈর্য্যের গাণিতিক হিসাব নিলে বোধ হয় প্রায় সমানই হবে। কেবল একটি অন্তর্মুখী, অন্যটি বহির্মুখী। দুটোই আমাদের আছে এবং অল্পবিস্তর দরকারও। কিন্তু কোনটার তীব্রতাই বাঞ্ছনীয় নয়। যা রয় সয়, তাই-ই দরকার।

কেউ বলতে পারেন না যে, তাঁর মধ্যে মরণবৃত্তি একেবারেই নেই; কিংবা থাকলেও এমন চেপে দিয়েছেন যে, সে মাথা তুলতেই পারে না! দুটোর মধ্যে কোনটাই ঠিক নয়। কারণ, আগেই বলেছি, মরণবৃত্তিই আমাদের যোগায় আক্রমণের প্রতি পাল্টা-আক্রমণ হানবার সংগ্রামীশক্তি; যার এই বৃত্তি নেই তার সংগ্রামী শক্তিও নেই। কিন্তু সংগ্রামী শক্তি নেই এমন স্বাভাবিক মানুষ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। আর এই বৃত্তিকে একেবারে গলা টিপে মেরে

ফেলাও অসম্ভব, কারণ এর স্থান অবচেতন মনের গভীরতম স্তরে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে আপনি মরণবৃত্তিকে লুকোতে পেরেছেন। কিন্তু যেহেতু তার স্থান অনেক গভীরে, তাই আপনার অজান্তেই কখন আত্মপ্রকাশ করে বসবে, তার ঠিক নেই।

ধরুন না কেন, সন্তোষবাবুর কথাই। আপিসে ভদ্রলোক ভারী অমায়িক, সকলের সঙ্গেই খুব মিষ্টি ব্যবহার। মনোবিজ্ঞানের কায়দায় বলতে পারেন 'স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিতা'! কিন্তু যখনই তিনি বিকেলবেলা বাড়ি ফিরিবেন, তখনই সব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পড়বে ভেঙে। সারাদিন অতি সাবধানে যে অবাঞ্ছিত মরণবৃত্তিকে চাকরির খাতিরে চেপে রেখেছিলেন, বাড়িতে এসে বিবেকের সেই কঠোরতা একটু শিথিল করে হাঁফ ছাড়বার সাধ আর কার না হয়? আর সেই সুযোগ পেয়েই শুরু হবে মরণবৃত্তির দাপট ছোট ছেলেমেয়ের ওপর! প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, খুব ছোট ছেলেমেয়েদের স্নেহ আর ঘৃণার স্থায়িত্ব খুব অল্প হয়ে থাকে। এরা কখনও ভালবাসে বাবাকে, কখনও মাকে, এবং জানবেন, সেটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং অস্বাভাবিক হবে তখন, যখন শিশুর স্নেহ বা ঘৃণা বাবা কিংবা মা —একজনের উপর কেন্দ্রীভূত হবে। শিশুর স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশের পথে এই সংবন্ধন সাংঘাতিক রকমের বাধার সৃষ্টি করে। বাবা বা মায়ের অসতর্ক মুহূর্তের কথাবার্ত্তা বা কাজকর্ম্মের ফলেই এই সংবন্ধন ঘটে যায়।

মোট কথা, এই দুই বৃত্তির দুটিকেই প্রকাশলাভ করবার সুযোগ দিতে হবে, চেপে রাখা যাবে না বরং বলি, উচিত হবে না।

আমাদের মধ্যে যে সংগঠনী প্রেরণা রয়েছে, তার উচিত পরিমাণ বিকাশ এবং অপরদিকে সহজাত সংগ্রামী প্রেরণারও সুনিয়ন্ত্রিত পরিতুষ্টির আয়োজন করতে হবে। সংগঠনী প্রেরণার মুক্তি দেওয়া সমাজে প্রশংসনীয়, তাই সে কাজ অনেক সহজ। একটা ছবি আঁকুন, রান্নাঘরে 'তরিবৎ' করে কোপ্তা বানান্ কিংবা একটা কাব্য বা সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করুন,—কিছু না পান, ফুলদানীর ফুলগুলোকে মনের মত করে গুছিয়ে রাখবার কাজে লেগে যান ঃ ব্যাস্, আপনার সংগঠনী প্রেরণা আপনাকে আনন্দ এনে দেবে!

কিন্তু মুস্কিল বাঁধে ঐ সংগ্রামী প্রেরণার মুক্তির ব্যাপারে। একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে কী, ঝঞ্ঝাটের আর অন্ত থাকবে না। তবে একে করবার সবচেয়ে সহজ, সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সকলের উপযোগী উপায় হচ্ছে খেলাধূলা। প্রত্যেক খেলাতেই আমরা চাই প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়। তবে বলেই রাখছি যে, ক্রীড়াজগতে যখন এর মাত্রা বেশী হয়ে পড়ে, তখন অনেক অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে—আমরা তখন বলি, 'স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান-শীপের অভাব'।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামলেও এই অসামাজিক বৃত্তির বাঞ্ছনীয় প্রকাশ সম্ভব হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীও চায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাজার থেকে সরাতে এর জন্যে তাকে করতে হয় কঠোর সংগ্রাম। যাদের প্রচণ্ড মরণবৃত্তি খেলাধূলা বা ব্যবসায় ইত্যাদি কোনও ক্ষেত্রেই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না, তাদের পক্ষে অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রই চরম অবলম্বন।

এই দুই তীব্র আদিম বৃত্তির উপযুক্ত মুক্তির জন্যেই ছেলেবেলাতে আমাদের প্রয়োজন হয় যথেষ্ট খেলার। এজন্যে শিশুদের খেলা

কমিয়ে দেওয়া বা কাগজকুটো কাটাছাঁটা করতে দেখলে কেড়ে নেওয়া খুবই অন্যায়। এগুলোর মাধ্যমে তারা প্রথমে ঐ মরণবৃত্তিকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে তাই ওগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুর কাগজ কাটাছাঁটার বৃত্তিকে উপযুক্ত পথে চালাতে পারলে তার সাহায্যেই তাকে শিল্পকাজ শেখানও কত সহজ হতে পারে, তা একটু ভাবলেই বোঝা যাবে। যেসব শিশুর এইসব কাজে অহেতুক বাধার সৃষ্টি করা হয়, তাদের অধিকাংশই বড় হয়ে অবাধ্য, অসভ্য, রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে ওঠে, দেখা গিয়েছে। এরাই পরে খিট্‌খিটে, ঝগড়াটে স্বভাব নিয়ে নিজের এবং পাঁচজনের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যাইহোক, এরপরে যখনই কারও সঙ্গে কলহ করবার একটা প্রবল ইচ্ছা আপনার মধ্যে জেগে উঠবে, তখনই ঝাঁ করে ছাদে গিয়ে ফুলগাছের টবে জল ঢালতে শুরু করে দেবেন, কিংবা কলঘরে ঢুকে খানকতক কাপড়-চোপড় নিয়ে ধপাধপ কাচতে বসে যাবেন! আবার যদি মনে হয়, 'জীবন অর্থহীন হয়ে উঠেছে,—বেঁচে থেকে লাভ নেই' তাহলে আর কিছু না পারেন, একখানা গল্পের বই নিয়ে বসে যান! না হয়, চলে যান আপনার পোষা গিনিপিগের বাক্সটার কাছে; গিয়ে সেটাকে খাবার দেবার ব্যবস্থা করুন। মোট কথা, আনন্দদায়ক কিছু একটা কাজ জুটিয়ে নিন, জীবনকে অনেক সুন্দর অনেক উজ্জ্বল বলে মনে হবে।

ভয়কে জয় করুন

গোবিন্দবাবুকে যতই বলি, 'দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ুন না, ভয়টা কী ?'—ততই তিনি বলেন, 'না মশাই, অপনিই বরং গিয়ে বলুন !'··· আচ্ছাই মুস্কিলে পড়া গেল লোকটাকে নিয়ে। শেষটা খুব চটে গিয়ে বলে ফেললুম, 'ধ্যেৎ মশাই, আপনি ভারী ভিতু! বড়সাহেব কি বাঘ না ভাল্লুক, যে আপনি ঢুকলেই গপ্ করে গিলে ফেলবেন ?'···

কথাটা বলেই ভাবলুম, বাঘ আর ভাল্লুকগুলোই কি কেবল ভয় পাবার মত ? ভয় জিনিসটা এমন কিছু একটা, যা মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, পাখি, কীটপতঙ্গ সকলকেই বিচলিত করতে পারে। শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স অবধি সবসবয়েই এই ভয় আমাদের শান্তির পথে বাধার সৃষ্টি করে। এই ভয় যন্ত্রণার ভয়, অশান্তির

ভয়, জীবনহানির ভয়।…তবে 'বড়সাহেবে'র সম্মুখীন হওয়ার যে ভয়টা, সেটা কি ধরনের যন্ত্রণা, কোন্ শ্রেণীর অশান্তি সৃষ্টি করে ?…

গোড়াতেই বলে নিই যে, ভয় জিনিসটা মনের একটা অস্বাভাবিক অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যখনই বুঝতে পারে যে, তার চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতার অধিকারী কোন শক্তি তার ওপরে আছে, তখনই তার মনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও সামান্যতা নিয়ে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই জটিলতাই ভয়ের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয়, যে যত বেশি অজ্ঞ হবে, ভয় জিনিসটা তাকে তত বেশি করে জড়িয়ে ধরবে। বড়সাহেবের মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অফিস-পরিচালনার বিরাট ক্ষমতার কথাই গোবিন্দবাবুর মনে ভয়ের সঞ্চার করেছিল, এটা বেশ বুঝতে পারা-গেল।

কিন্তু এ ছাড়া আরো অনেক কথা আছে। আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে নিজেকে বিপদ-মুক্ত রাখার একটা স্বার্থপরতা সদাজাগ্রত রয়েছে, একথাটা যেন না ভুলি। এ একটা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, যা সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই নিহিত আছে। এই প্রবৃত্তির মজা হচ্ছে এই যে, সে আমাদের প্রত্যেকের দুর্ব্বলতার হাঁড়ির খবর রাখে। শারীরিক, মানসিক, চেতন, অবচেতন—সব রকম দুর্ব্বলতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই স্বার্থপরতাই আমাদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেছেন যে, মানসিক দুর্ব্বলতাকে 'দুর্ব্বলতা' না বলে 'আত্মবিশ্বাসের অভাব' বললেই ভাল হয়। কেন না, মনের শক্তি স্বর্গীয়, তা কখনো দুর্ব্বল হতে পারে না। শুধু দরকার সেই স্বর্গীয় শক্তির ওপর বিশ্বাস। কথাটাতে দার্শনিক

গন্ধ থাকলেও এটি বাস্তবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সত্য। তাই গোবিন্দকে আত্মবিশ্বাসের সাধনা করতে পরামর্শ দিতে হল!

আত্মবিশ্বাসের সাধনা করতে বলা যত সহজ, ও জিনিসটিকে আয়ত্ত করা ততটা সহজ নয়। কিন্তু যত কঠিনই হোক, ভয়-বিনাশের অমোঘ অস্ত্রই হল এই আত্মবিশ্বাস এবং তার সাধনা সকলকেই করতে হবে।

স্বার্থপরতা যখন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে, তখন বাইরের সব কিছু জিনিসের ওপর অজ্ঞতা বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও। আত্মকেন্দ্রিকতা তখন আর সকলকে খুব সন্দেহ করে চলতে থাকে। বাবা, মা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই সে আপন সত্তা থেকে অনেকখানি পৃথক করে দেখতে শুরু করে। যা কিছু তার ধারণার সঙ্গে মিল খায় না, তাকেই এড়িয়ে চলতে চায়। এই এড়িয়ে চলাটাও ভয়। কিন্তু কেন এই এড়িয়ে-চলা? নিজের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস যদি থাকে, যে কোন অবস্থার সঙ্গে সমন্বয় বিধানের কৌশল যদি জানা থাকে, তবে কিসের ভয়? আত্মবিশ্বাস আপনাকে সাহায্য করবে সন্দেহের সম্মুখীন হতে, প্রেরণা দেবে সন্দিগ্ধ ভীতিকে প্রয়োজন মত সমন্বয় সাধনের, এমনকি তাকে নিজের কাজে লাগাতেও।

কয়েক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা কোন কাছে হাত দেবার আগে ভাবেন, "কিভাবে কাজটাকে নিরাপদে হাসিল করা যায়?" এঁদের 'বাস্তববাদী' বলতে দোষ নেই। কিন্তু অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা ভাবেন, "কাজটা করতে হলে কোনগুলো 'এড়িয়ে চলা' দরকার!" এঁরা নার্ভাস! লক্ষ্যের দিকে এঁদের

দৃষ্টি বিশেষ থাকে না ; থাকে পথের আনাচে-কানাচে কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা তাঁর চলার পথে বাধা সৃষ্টি করবার জন্যে, তার ওপর। অতিরিক্ত সতর্কতা এঁদের চলার গতিকে মন্থর করে, পদক্ষেপকে লঘু করে, আর সাফল্যকে করে বিলম্বিত।

ছোট শিশু আগুনকে ধরতে যায়, দোলনা থেকে পড়ে-যাওয়া খেলনা কুড়োবার জন্যে ঝাঁপ মারে। তখন সে ভয়ের খপ্পরে পড়েনি। জানলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন যে, একমাত্র নিরাপত্তার অভাব আর ভীষণ শব্দের প্রতি ভয় ছাড়া আর কোন ভয়ই আমাদের সহজাত নয়, সবই শেখা হয়েছে অজ্ঞাতে অজান্তে! বাড়ির ছোট্ট খোকাটিকে খুব উঁচুতে ছুঁড়ে লোফালুফি করলে, কিংবা অন্ধকার ঘরে একলা রেখে চলে গেলে,—সে কাঁদবে নিরাপত্তার অভাবে ভয় পেয়ে। কিন্তু একজনকে কিম্ভূতকিমাকার বিকট সাজ-পোষাক, মুখোস পরিয়ে ঐ 'অনাঘ্রাত পুষ্পের' মত শিশুটির সামনে আনুন। আপনি শিশুটিকে আদর করতে থাকুন। বিকটাকার সং-সাজা লোকটির দিকে চেয়ে হাসতে থাকুন, তাকে চাট্টি ছোলাভাজাও খেতে দিতে পারেন! দেখবেন, শিশুটিও আনন্দ পাচ্ছে, বিকট হলেও সং দেখে সে ভয় পাচ্ছে না।…বেশ, এবার সংটিকে একটা হুঙ্কার ছাড়তে বলুন, কিংবা আপনি হঠাৎ 'ওরে বাবারে, খল্লেরে' বলে হাঁউমাঁউ করে উঠুন—দেখবেন, শিশুটি কেঁদে উঠেছে! তার মনে এমনি করে আপনি একটি বিশেষ আকৃতি সম্পর্কে ভয়ের জন্ম দিলেন।

আর একটি গল্প বলি। একটি ছোট্ট শিশুকে খুব রঙচঙে একটি ভেঁপু কিনে দেওয়া হয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখছে

ভেঁপুটিকে, ব্যবহার করবার কায়দা জানে না। কিন্তু ভাল লেগেছে। তার দাদা এসে দেখে যে, ভেঁপুটিকে খোকা এমনভাবে জাপটে ধরেছে যে, পিণ্ডি পাকাবার জোগাড়! সে ছাড়াতে গেল, পারল না। তখন ব্যর্থ হয়ে ভেঁপুটিতে খুব জোরে এক ফুঁ দিল! ভেঁপু বাজল অকস্মাৎ ভীষণ শব্দে। খোকাটি এই হঠাৎ শব্দে ভয় পেয়ে ভেঁপুটিকে ছেড়ে দিল। আরও বার কয়েক খুব জোরে ভেঁপুটি বাজাবার পর দেখা গেল, প্রত্যেকটি আওয়াজের পর সে খুব কাঁদছে। তাকে খুশি করবার জন্যে যতই ভেঁপুটি তার কাছে নিয়ে গিয়ে জোরে জোরে বাজান হচ্ছে, সে ততই কাঁদছে। পরের দিন সবাই দেখল, ভেঁপুটি তার কাছে আনলেই সে কেঁদেকেটে অস্থির হচ্ছে! আমরা এই ধরনের কৃত্রিম উপায়ে ভয়ের সৃষ্টিকে চলতি কথায় বলি ফোবিয়া বা অহেতুক ভীতি। ভয়টা এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, ফলে কিছুদিন পরে ভয়ের হেতু খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এমনি অনেক অহেতুক বিষয়ে ভয় আছে, সেগুলি সবই এই পর্য্যায়ে পড়ে। শোনা যায়, নেপোলিয়ানের মত বীরপুরুষও বেড়াল প্রাণীটিকে ভাল চোখে দেখতে পারতেন না! তাঁর শৈশবের মনঃসমীক্ষণ করলে হয়ত দেখা যেত যে, কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বোধ হয় বেড়ালের আঁচড়-কামড় খাওয়ার ফলে সমগ্র বেড়াল-জাতটার ওপরেই তাঁর একটা অহেতুক ভীতি (এবং পরে ঘৃণা) জন্মে গিয়েছিল!

ছোট্ট মেয়ে রুবী খরগোস দেখলে বড্ড ভয় পেত। আর পশম বা ফারের দামী দামী নরম পোষাক কিছুতেই পরতে চাইত না।

মনঃসমীক্ষণ করে ধরা পড়ল যে, খুব ছেলেবেলায় তাকে একবার একটি পোষা বেড়াল খুব আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছিল। সেই থেকে বেড়ালের মত নরম তুলতুলে লোমশ সবকিছু জিনিষের ওপরেই তার একটা অহেতুক ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল।

ছোট্ট ঝণ্টুর কথা শুনুন।—ওদের পাড়ায় এক খোঁড়া লোক ছিল, সে 'ক্রাচ্' নিয়ে চলাফেরা করত। ঝণ্টু আর তার বন্ধুরা তাকে 'খোঁড়া ল্যাংল্যাং' বলে রোজ খ্যাপাত। এতে তারা খেলার আনন্দ পেত! লোকটিও বিরক্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তার ক্রাচের আস্ফালন দেখাত। একদিন কেমন করে ক্রাচের একটি খোঁচা খেয়ে ঝণ্টু ভূতলশায়ী হয়েছিল। সেই থেকে খোঁড়া লোকটিকে দেখলেই সে ভয়ে অদৃশ্য হত। শুধু তাই নয়, রাস্তাঘাটে কোন-খোঁড়াকে দেখলেই সে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ত। ১০।১২ বছর বয়স পর্য্যন্ত সে এই অহেতুক ভীতিতে কষ্ট পেয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা 'ফোবিয়া'র এক তালিকা তৈরি করবার চেষ্টাও করেছেন। যেমন, অনেকে উঁচু জায়গায় উঠলে ভয় পান (এক্রোফোবিয়া), ফাঁকা জায়গায় গেলে গা ছম্ ছম্ করে (এগোরাফোবিয়া), মেয়েদের দেখলে এড়িয়ে চলেন (জাইনেফোবিয়া), কিছু ছুঁলেই অসুখ করবে, এই ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকেন (প্যাথোফোবিয়া), অঙ্কের হিসাব দেখলেই সরে পড়বার চেষ্টা (ফিগারফোবিয়া), ইত্যাদি। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে এমনি অধিকাংশ অহেতুক ভীতির মূল কারণটুকু ধরতে পারামাত্রই সেই ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

ভয়ের সঙ্গে লড়াই করে তাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা

করবেন যত, সে তত আপনাকে জড়িয়ে ধরবে। ভয়কে মন থেকে একেবারে দূর করবার উপায় হল গভীর চিন্তার দ্বারা ভয়ের আসল কারণটুকু উদ্ধার করা। দেখবেন, যে-মুহূর্ত্তে ভয়ের মূল কারণ খুঁজে পাবেন, সেই মুহূর্ত্তেই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে আপনি শক্তিমান হয়ে উঠবেন। ভয়ের অর্দ্ধেক তখনই অন্তর্হিত হবে। বাকি যা থাকবে, তা সামান্য সংগ্রামেই পালাবার পথ পাবে না!

ভয় যখন শাখাপ্রশাখা মেলে মনের অনেকখানি অংশ জুড়ে বসে এবং আসল কারণটিকে ঢাকা দিয়ে রাখতে পারে, তখনই আমাদের দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। উদ্বেগ জিনিসটা ভয়েরই ছদ্মরূপ। একটা সন্দেহকে খুব চিন্তা করতে থাকলে সেটা স্থায়িত্ব লাভ করে এবং সব সময়েই সমস্ত স্নায়ুতে একটা অসোয়াস্তির ভাব জাগিয়ে রেখে দেয়। ‘উদ্বেগ’ থেকে মুক্ত থাকতে হলে সর্ব্বদা নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন। কাজের মধ্যে ভুলচুক হলে দিনরাত মনের মধ্যে সেকথা তোলাপাড়া করবেন না। ভুল সকলেরই হয়, তা নিয়ে দিনরাত চিন্তা করলে তো আর ভুলের মাশুল কমানো যাবে না! হাসিখুশি থাকবার চেষ্টা করুন! জানবেন, ভুল অনেক সময়ে নতুনত্বের সন্ধান এনে দেয়!

মনের যত প্রক্ষোভ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল এই ভয়। ভয় পেয়ে শুধু মানুষ কেন, জন্তু-জানোয়ারও অনেক দুঃসাধ্য কাজ করে ফেলে। একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে এই ভয় জিনিসটাই সারা জগতটাকে ‘টিট্’ করে রেখেছে! জগতের সব-দেশেই ‘ধর্ম্ম’ নামে যে জিনিষটি প্রচলন আছে, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাতে মানুষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নেওয়া হয়েছে

আগাগোড়া। কথাটা দুঃসাহসিক এবং অনেকেই একথা শুনে বিরক্ত হবেন। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতিটি নির্দ্দেশের মধ্যেই মানুষের মনে 'পরম-শক্তির অনন্তত্ব'র এবং সংসারের অসারত্ব সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন ভীতি সৃষ্টির সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা নেই, এমন কথা জোর গলায় কেউ বলতে পারবেন কি? আদিম যুগের কথা ভেবে দেখুন তো, ভীতিবিহ্বল মানুষ 'বাঁচবার জন্যে লড়াই' করতে নেমে কেমন করে সভ্যতার এক একটি সোপান গড়ে তুলছে। উদারভাবে বলতে গেলে, অস্তিত্ব লোপ পাবার সেই ভয় আজও মানুষকে সবরকম ভাল-মন্দ কাজে এগিয়ে দিচ্ছে।

'নির্ভীক' কথাটার ভাষাগত অর্থ মানতে গেলে বলতে হয়, ওরকম কোন প্রাণীর ইহজগতে প্রাণধারণ করা অসম্ভব। 'ভয়' বলে কোন জিনিসকেই যে জানে না, মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সে বাঁচতেও জানে না। ভয় আমাদের সতর্ক করে দেয় আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। জলে-ডোবা মানুষ ভয় পায় বলেই বাঁচবার চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। অনেকে আর্থিক-অনটনের ভয়ে খুব বিচলিত হন। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি যিনি, তিনি এই ভয়কে ভবিষ্যতের দুর্দ্দশার সঙ্কেত হিসেবে গ্রহণ করবেন, এবং চেষ্টা করবেন, আয় বাড়াতে আর ব্যয় কমাতে, সম্ভব হলে কিছু কিছু সঞ্চয় করতেও। ভয় যদি তিনি না পেতেন এবং ভয়কে যদি ঠিকভাবে কাজে না লাগিয়ে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতেন, তাহলে অকস্মাৎ একদিন আর্থিক-অনটনের বিভীষিকা তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারত অনায়াসে।

ভয় আমাদের বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে বটে,

কিন্তু তার মেয়াদ খুবই অস্থায়ী ও সাময়িক হওয়া উচিত। ঘুম ভেঙে যেতে দেখলেন, বাড়ীতে আগুন লেগেছে, ভয় পেলেন। এই 'ভয়' আপনার মধ্যে কোথা থেকে যেন এক অপরিমেয় শক্তির সঞ্চার করল। আপনি প্রাণপণে বেরিয়ে এলেন বাড়ী থেকে। কিন্তু বাইরে এসে ভয়কে আর অতখানি প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। ভবিষ্যতে কোনও সময়ে কোন অগ্নিকাণ্ডে লোকে আপনার সহায়তা চাইলে যদি আপনি আগুনের ভয়ে পিছিয়ে পড়েন, তাহলে বুঝতে হবে আগেকার ভয় এখনো আপনার মনে অবাধ রাজত্ব করছে। তাকে আপনি অস্থায়ী সত্তা দিতে পারেননি। তাই সে আপনাকে এখন আর অপরিমেয় শক্তি সরবরাহ করে না, বরং আপনাকে দুর্ব্বল এবং লোকচক্ষে ভীরু প্রতিপন্ন করে ফেলছে দিনদিন। অতএব ভয়কে কোনমতেই পাকা ইজারা দেবেন না।

ধরুন, কেউ আপনাকে বলেছে, 'ও মশাই, চিলে আপনার কান নিয়ে গেল!' আর আপনি অমনি (রাগ করবেন না!) "তাইত, কী সর্ব্বনাশ! কোথায় গেল চিলটা! কী হবে!"—ইত্যাদি বিলাপ করতে করতে যদি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে বুঝব আপনি 'আতঙ্কিত' হয়েছেন। আর যদি কথাটা শুনে কেবল কানে হাত দিয়ে আগে বোঝবার চেষ্টা করেন, কানটা চিলে নেওয়ার কথাটা সত্যি কি না, কিংবা কথাটা আদপে সত্যি হতে পারে কি না, তাহলে বলা যেতে পারে, আপনি 'আশঙ্কিত' হয়ে আশঙ্কার মূল কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন এবং ফলে আশঙ্কামুক্ত হতেও পেরেছেন কোনওরকম মানসিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করেই। আতঙ্ক আর আশঙ্কা—এ দুয়ের মধ্যে এটুকুই তফাত। একটি যুক্তিহীন,

বিভ্রান্তিকর। অপরটি বিপদমুক্তির সহায়ক, আত্মশক্তির উন্মেষক। প্রথমটির পাল্লায় পড়লে আপনি আগুনলাগা বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার পথ হারিয়ে ফেলতেন, উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারতেন না। আতঙ্ককে আশঙ্কার চেয়ে তুচ্ছ মনে হলেও সূর্য্যের নীচে বালির মতই এর তেজ বেশি, ক্ষতি করে বেশি।

এখন, এই ফর্মুলা আপনার নিজের উপর পরখ করে দেখুন, ভয় পেলে আপনি আশঙ্কিত হন, না, আতঙ্কিত হন! আশঙ্কা আপনাকে সজীবতা, তৎপরতা এনে দেয়, না, আতঙ্কের হিমস্পর্শে আপনার প্রাণশক্তির অপচয় ঘটে!

বাঁচতে সবাই চায়

কত খরচই না করতে হচ্ছে মানুষকে এই বাঁচবার জন্যে! কত পরিকল্পনা, কত পরিশ্রম, শুধু এই বেঁচে থাকার খরচ জোগাতেই বেবাক খতম হয়ে যাচ্ছে, ঠিক নয় কি? আর এই জন্যেই তো অর্থনীতি জানুন আর নাই জানুন, সকলেই সুবিধে পেলে "কস্ট্ অব লীভিং" নিয়ে দু'চার কথা বলে নেবারও সুযোগ পাচ্ছেন!

মানুষ চায় নিজের উন্নতি, নিজের বিকাশ। কিন্তু উন্নতি 'লাভ' করতে হলেই 'মূল্যে'র কথা স্মরণে না এনে উপায় কি? 'উন্নতি করতে হবে, বিকশিত হতে হবে'—এই স্বপ্নই কি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে সরিয়ে রাস্তা করে দেবে? কেবল স্বপ্নতেই কি আকাশে ফুটে উঠবে কুসুম? না; দিতে হবে 'মূল্য', বাঁচবার খরচ, পথ চলবার

খরচ। ঢালতে হবে উদ্যম, যত্ন, পরিশ্রম, আন্তরিকতা ; মোটা কথায়—এই-ই হল বাঁচবার খরচ !

আপনি বলে উঠবেন, "এ আর এমন কি কথা ! একটা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়োজন এই কথা বলতে চাইছেন তো ?" হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন ! ঐ কথাটাই আমি বলতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু দুঃখটা কোথায় জানেন ? আপনিও জানেন, আমিও জানি, সমস্ত লোকেই অল্পবিস্তর এই কথাটা জানেন, অথচ কাজে লাগাতে পারাটা আর কারোই হয়ে ওঠে না। মানসিক অসামঞ্জস্য, অস্থিরতা —এমনি একাধিক বিকৃতির মূলেই আছে এই প্রবৃত্তি—না খেটে, ঝঞ্ঝাটের মধ্যে না গিয়ে স্বর্গসুখ লাভের স্বপ্ন ! অবচেতন মনের এই স্বর্গসুখ-স্বপ্ন দেহকে অলস করে তোলে, মনে হয়, আহা, পারতুম গো এ কাজটা—কিন্তু শরীরটা বেজায়…ইত্যাদি !' বুঝে দেখুন ব্যাপারখানা ! এমনি যখনই হবে, তখনই বুঝতে হবে, মনের অহম্ বা বিবেকের ওপর ইদম্ বা আদিম প্রবৃত্তির আধিপত্য চলছে।

মন যে এমন একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ অহরহই করে চলেছে, একথাটা প্রথমেই বিশ্বাস করা যায় না, ঠিকই। কারণ এ এক রহস্যময় বিশ্বাসঘাতকতা। মনে করুন, একটি ছেলে পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে। যতই দিন আসে এগিয়ে, ততই তার ভয় বাড়তে থাকে, সে বুঝি ফেল, করবে। মনের কোণ থেকে কে যেন তাকে কেবলই শাসাচ্ছে, "ওহে, সারা বছর তো 'তিনটে-ছ'টা' করে কাটিয়েছ। এখন তো আর আশা দেখি না !" ছেলেটির মুখ আসে শুকিয়ে, পরীক্ষার আগেই সে বিফলতার সোপানে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে।

অবচেতন মনে সে ভাবতে শুরু করে, কি করে এই পরীক্ষার ঝঞ্ঝাটটাকে এড়ানো যায়। যদি এই চিন্তা খুবই তীব্র হয়ে ওঠে, তবে সমস্ত বিবেক-বুদ্ধি কাত হয়ে পড়বে। পরীক্ষার মুখে বা পরীক্ষার দিনে ছেলেটিকে দেখা যাবে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছে। কোন কৃত্রিমতা নেই সে অসুখে, ডাক্তারও এসে অসুস্থতা স্বীকার করে যাবেন। দিয়ে যাবেন দৈহিক স্বাস্থ্যোদ্ধারের ব্যবস্থা।

কিন্তু মনের স্বাস্থ্যের কি পথ্য হবে? মনের পথ্যের ব্যবস্থা দিতে হলে জানতে হবে যে, মনের চেতন আর অবচেতন, এই দুই কক্ষের মধ্যে সদাসর্ব্বদাই একটা টানাহেঁচড়া চলেছে। অবচেতন মন হল ভাঁড়ার ঘর, চেতন মনকে বলতে পারি রসুইখানা! ভাঁড়ার ঘরের 'ইন-চার্জ' বলেই বোধ হয় ভারী দেমাক ঐ অবচেতনের! দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ওর। কিন্তু আমরা ক'জন রাখি সে খবর? কর্ম্মক্ষেত্রে জয়-পরাজয় উভয়েরই পেছনে আছে এর দায়িত্ব। পরাজয়ের জন্যে অপর কোন-কিছুর ওপর আমরা সাধারণত যে গায়ের ঝাল ঝেড়ে থাকি, সেটা এই রহস্যের প্রতি অজ্ঞতারই ফল। অতএব মনের পথ্য-ব্যবস্থা করতে হলে এই প্রবল-প্রতাপ অবচেতন মনের তোয়াজ করতে হবে; একে করে নিতে হবে আমাদের বিজয়-অভিযানের সারথি! তবে হ্যাঁ—সারথি যদি বেসামাল হয়ে পড়ে, আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করে, তবে রথসমেত পাতাল-প্রবেশের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

ডাঃ জেকিল আর মিঃ হাইডের মত মনের এই দু'মুখী ব্যবহার যে ধারণার অতীত, একথা আগেই বলেছি। এই আলোচনার ফলে

আমরা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কথাগুলো খুবই দরকারী। অনেকে মনে করেন, অবচেতন মনের ওপর কোন চিন্তাকে গভীরভাবে এঁকে দিতে পারলেই কাজ ফতে! হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি? একেই তো আমরা বলি, 'মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়া।' কাজ তখন হতে থাকে কলের মত, অনেক সময়ে আমাদের অজান্তেই।

তাহলে অবচেতন মনের এই শক্তির কথা অস্বীকার করছেন না তো? বেশ, তবে একথাটাও স্বীকার করবার চেষ্টা করুন যে, অবচেতন মনের মধ্যে কোন কাজকে এড়িয়ে চলবার, জয়লাভের ঝঞ্ঝাটকে পাশ কাটিয়ে চলবার ইচ্ছেটাও যদি এমনিভাবে কখনো আসন গেড়ে বসতে পারে, তখন ঘটবে ভারী সর্ব্বনেশে ব্যাপার! এই ধরনের ইচ্ছা বা চিন্তা পরিষ্কার ভাষার প্রকাশ পায় না। তবে মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী বলে ওজরে-আপত্তিতে সুকৌশলে মার্জ্জিত উপায়ে এই সব ইচ্ছাকে মাঝে মাঝে ভাষায় রূপ দিতে থাকে।

জানবেন, জীবনের উন্নতিলাভের উপযুক্ত মূল্য দিতে যাঁরা কার্পণ্য করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই মানসিক বিশ্বাসঘাতকতার খপ্পরে পড়েছেন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে সদাজাগ্রত এক 'ডিক্টোফোন'—অবচেতন মন। প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয়—সব চিন্তাকেই রেকর্ড করে রাখা তার কাজ; সে কাজ চলেছে বিরামবিহীন, আজন্ম। শুধু রেকর্ড করে গাদাবন্দী করে রাখলে মানুষের মনের এই রহস্যময় কাহিনী প্রচার করবার কোন প্রয়োজনই হত না। আর তাহলে হয়ত 'পুরোনো কাসুন্দি চট্‌কানো'র তিক্ততা থেকেও মানুষ রেহাই পেত; কেউ কেউ বলেন, শান্তিও

কথা শোন নি?' চোখ ফেরাতে পারি না, সাড়া না দিয়ে পারি কৈ?

সিনেমা, খবরের কাগজ, রেডিও, 'বিশিষ্ট' বক্তা—কোনটিকেই আমরা এড়িয়ে চলতে পারি না। অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরে এরা আমাদের অভিমতকে। মনের কথা, ঘরের কথা—সব কথাই যেন শুষে জেনে নেয় আর প্রায়ই দেয় পাল্টে—দেয় নতুন ছাঁচে গড়ে। আমরা আপত্তি করবার ফুরসতই পাই না! অজান্তেই কখন জেনে ফেলি যে, অমুক কোম্পানির সাবান ভারী চমৎকার, ওই নেতাটির 'পলিসি' দেশের পক্ষে উপকারী।

নিজের কথা অপরের মনে প্রভাব বিস্তার করুক, সকলে সেই কথাটার মূল্য উপলব্ধি করে কাজে লাগাক—এই আশা সকলেরই। এটাই হল মনের ওপর প্রভাব বিস্তারের মূল কথা, আর একাজ সম্ভব সুদক্ষ লোকের পক্ষেই। বিজ্ঞাপনেই বলুন, আর আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনেই বলুন,—মানুষকে বিরক্ত না করে কিভাবে তাকে কোন এক বিশেষ পথে চালিত করা যায়—এ কৌশল আমরা সর্ব্বদা সকলেই কাজে লাগাচ্ছি। দুবছরের শিশুরাও খেলা করতে বসে সমবয়সীদের মধ্যে খেলনার অধিকার সম্পর্কে মীমাংসায় আসবার জন্যে তাদের অজান্তেই একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু বয়স্ক জীবনে প্রভাব বিস্তারের কৌশলটা বেশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই আয়ত্ত করতে হয়, নচেৎ পদে পদে বিপদ। আপনি পছন্দ করুন আর নাই করুন, অপরের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা দিনের মধ্যে একাধিকবার ঘটেই থাকে। আপনি বা আমি কেউই একে এড়িয়ে থাকতে পারি না।

মানুষকে বিরক্ত না করে তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আপন মতাবলম্বী করাটা সভ্য সমাজের অন্যতম ভব্যতা। মানসিক প্রভাব বিস্তারের পথ ছেড়ে শারীরিক বা অন্য উপায়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাটা আদিমযুগের।

প্রত্যেকদিনই আমরা প্রত্যেকেই একাধিক লোকের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছি। কিভাবে, সেটা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। কেউ করেন ভাল পথে, কেউ বা মন্দ পথে। তার মানে এই নয় যে, প্রভাব বিস্তার করাটাই খারাপ ; বরং বলা যেতে পরে যে, প্রভাব বিস্তারের পন্থাটার মধ্যেই ভাল-মন্দ বিচার করতে হবে।

দৈনন্দিন জীবনে যখন মানসিক প্রভাব বিস্তারের হাত থেকে এড়িয়ে চলা একান্তই সম্ভব নয়, তখন এর ভাল-মন্দ কৌশল নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক্।

প্রভাব বিস্তারের মন্দ পন্থা বলব কাকে? আপনি যা চান, প্রভাব বিস্তারের ফলে সেটাই যদি পেয়ে যান, তবে তার মধ্যে খারাপটা কোথায়—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। যে প্রভাব বিস্তারের ফলে 'নিষ্প্রাণ সাড়া' পাওয়া যায়, তাকে বলব নিকৃষ্ট পন্থা। অনেকে মনে করেন, উপদেশ, পরামর্শ ও যুক্তি দিয়ে ঘায়েল করে ফেলতে পারলেই প্রভাব বিস্তার করা হল। কোন কোন শিক্ষক তাঁর ক্লাশের ছাত্রদের কতকগুলো খালি কলসী বলে মনে করে থাকেন। কলসীগুলো মুখ হাঁ করে রয়েছে—আর তিনি জ্ঞানের অমৃত ঢেলে যাচ্ছেন তাতে, আকণ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত!···প্ল্যাটফর্মে বক্তা মাইকের সামনে ঘুসি নাচিয়ে তারস্বরে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন—

শ্রোতৃমণ্ডলী তা কানে নিচ্ছে কি না নিচ্ছে—সেদিকে খেয়াল না রেখেই। শ্রোতারা হয়ত তখন সভামণ্ডপের আড়ম্বর দেখছে, কিংবা পরস্পর বাজার দর নিয়ে গভীর আলাপে মগ্ন। হয়ত বা কোন শ্রোতার মন সভামণ্ডপ থেকে বহু মাইল দূরে বিচরণ করছে।··· অফিসের বড়বাবু কর্ম্মচারীদের ডেকে বলছেন, 'এটা করুন, ওটা করবেন না'—কিন্তু কতক্ষণ যে এই হুকুম ঠিকমত মেনে চলা হবে, সে কথা তিনি ভাবতে চান না বড় একটা···ঠিক যেন ঘোড়সওয়ার ঘোড়াকে খোঁচা দিয়ে খুব দৌড় করাচ্ছে, আর মনে করছে, ঘোড়াটার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী গতিটাই বুঝি সে পাচ্ছে।··· কারখানার কুলিসর্দ্দার যতক্ষণ হাঁকডাক চালায়, ততক্ষণই কুলিরা তার কথামত বেশ চটপট কাজ করে, আর ভাবখানা দেখায় যেন সর্দ্দারই ভগবান।···কানভাসার যারা, তারা কথার তুবড়ি ছুটিয়ে আপনাকে বেশ কাহিল করে দেয়। আপনিও ঐ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ক্যানভাসারের যা হোক কিছু মাল কিনে নিয়ে তাকে বিদেয় করতে পারলেই যেন বাঁচেন। ক্যানভাসারটিও মনে করে, সে বুঝি 'ফার্ষ্ট ক্লাস এক্সপার্ট'—বিজয়গর্ব্বে সে হয় উল্লসিত। কিন্তু আপনি কি তার প্রভাব খুশী মনে নেন? দ্বিতীয় বার সে দেখা করতে এলে আপনি কি বিরক্ত হন না? অতএব আপনি যে তার মাল কিনলেন, এটাকে 'নিষ্প্রাণ সাড়া' ছাড়া আর কি বলা যায়?

এসব পন্থাগুলিই ভুল পন্থা, কারণ এদের পরিণাম ভাল নয়। এগুলোর পরিণামকে 'নেগেটিভ-পজিটিভ' সাড়াও বলা চলে। অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে 'পজিটিভ' সাড়া মনে হলেও আসলে পজিটিভের ছদ্মবেশে নেগেটিভেরই আবির্ভাব হচ্ছে।

এক ক্লাশভর্ত্তি ছাত্রের সামনে মাষ্টারমশাই যত কথা বলে যান, তার কতটুকু ছাত্রদের পরবর্ত্তী জীবনে কাজে লাগাবার জন্যে তোলা থাকে? কতটুকু তাদের মনের মধ্যে ঠিকভাবে প্রবেশ করে? ক্লাশের পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি প্রশ্ন করা যায়, তাহলে যদিও-বা দু'একটা জবাব তারা দিতে পারে,—কিন্তু কয়েকদিন পরে প্রশ্ন করলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। কেন এমন হয়? কারণ, ছাত্রের মনে শিক্ষকের কথার কোন প্রভাবই পড়েনি। ছাত্রও শেখেনি, শিক্ষকও 'শেখাতে পারেননি'! সব ব্যাপারটাই হয়ে চলে ব্যর্থ অভিনয়।

মাষ্টারমশাই ক্লাশ ছেড়ে চলে গেলেই ছাত্রেরা যে যার 'লাঙ্গল তুলে ধরে'! বড়সাহেব 'রাউণ্ড' দিয়ে পেছন ফিরতে না ফিরতেই কেরাণী-মণ্ডলী আবার ঠ্যাং তুলে দেন টেবিলে—ক্যানটিন থেকে ধূমায়িত চা আসে আর এক দফা। কুলিসর্দ্দার লম্ফঝম্প শেষে একটা বিড়ি ধরাতে না ধরাতেই কুলিরা আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চাঁচতে লেগে যায়। বড্ড খাটুনি! ছাত্র, কেরাণী ও কুলি—এদের সকলেরই সাড়ার মধ্যে প্রাণ নেই। এদের কর্ম্মপ্রেরণা অস্থায়ী এবং অনিচ্ছাকৃত। স্থায়ী প্রেরণার কোন সম্ভাবনাই এখানে নেই। এটা ঠিক যে, শিক্ষক, বড়সাহেব, কুলি-সর্দ্দার—সকলেরই ইচ্ছানুসারে কাজ চলেছে—কিন্তু কতক্ষণ, কতটা, কিভাবে? এই ধরনের কর্ম্মতৎপরতা আদায় করার ফলে কোন-পক্ষই লাভবান হন না, একথাটা বৈজ্ঞানিক সত্য, মনোবৈজ্ঞানিক সত্য।

তাহলে লাভবান হবার পক্ষে সঠিক পন্থা কোন্‌টি? সঠিক পন্থা

অবলম্বন করতে হলে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করতে হবে। নীতি-গুলির মধ্যে প্রধান এবং প্রথম যেটি, সেটি, হল এই: "আপনার চাওয়ার সঙ্গে অপরের চাওয়ার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটাতে হবে।" এরই ফলে আপনি পেতে পারেন, প্রাণময় সাড়া—যাকে বলতে পারেন, একেবারে 'পজিটিভ-পজিটিভ'! এই প্রাণময় সাড়াই হতে পারে স্থায়ী আর সজীব।

সুশীলবাবু যা চান—আপনিই ঠিক তেমনটিই চান,—এই বিশ্বাসটা সুশীলবাবুর মনে যখন আপনি জন্মাতে পারবেন, তখন আপনি তাঁর সহযোগিতা পাবেন। সুশীল বালকের মতই তিনি তখন আপনার 'মতে' এসে খুশীই হবেন। ইণ্টারেষ্ট বা অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারাটাই আসল কথা। এই অনুরাগ যখন সৃষ্টি হবে, তখন আপনার মনের সঙ্গে সুশীলবাবুর মনের সেতুবাঁধা হয়ে যাবে। ক্যানভাসারকে তখন আর মালের গুণকীর্ত্তন করতে হবে না খুব বেশী, খদ্দের নিজের প্রয়োজনেই খুশীমনে দু-দশটা মাল কিনে নেবেন। মানুষের মনের ওপর স্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তারের এই হল রহস্য।

স্কুলের শিক্ষক যাঁরা, ছাত্রদের মনের ওপর স্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তারের কৌশলটা তাঁদের ভাল করেই জানা দরকার, যাতে করে 'পজিটিভ-পজিটিভ' সাড়া পাওয়া যেতে পারে। বেত্র আস্ফালনের প্রয়োজন তখন হয়ত একেবারেই হবে না।…ধরা যাক্, স্কুল লাইব্রেরির বই বড্ড ছিঁড়ছে—নোটিশ দিয়ে দিয়ে, ফাইন করেও কমছে না। এখানে ছাত্রদের মধ্যে সৃজনী চেতনা জাগাতে হবে। ড্রইং বা ক্রাফ্‌ট ক্লাশে এক একদিন বইয়ের জ্যাকেট তৈরি এবং তাতে কেমন করে রং-চং দিয়ে চমৎকার করে তোলা যায় শেখান হল।

মাসখানেকের মধ্যে সারা স্কুলে সমস্ত ছেলের বইতেই তাদের কাঁচা হাতে তৈরী রং-বেরংয়ের জ্যাকেট মোড়া দেখা যেতে লাগল। 'বই সুন্দর দেখাক্'—এই চেতনা তাদের মধ্যে জেগে উঠেছে। এদিকে দেখা গেল, লাইব্রেরির বই ছেঁড়ার হিড়িকও অনেক কমে গেছে! ছেঁড়া তো দূরের কথা, লাইব্রেরির অনেক বই জ্যাকেট-সজ্জিত হয়ে ছাত্রদের বাড়ী থেকে ফেরৎ আসতে লাগল! সৃজনী চেতনা জাগানোর ফলেই এই দুঃসাধ্য কাজ সহজসাধ্য হল। ক্লাশঘর নোংরা করা, দেয়ালে আঁচড় কাটা, অথবা গোলমাল করা—সব ব্যাপারেই সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক প্রভাব বিস্তার করতে পারা যায় এইভাবে। শাস্তির হুমকি দিয়ে 'পজিটিভ্-পজিটিভ্' সাড়া পাওয়া যায় না। শিশুরা নিজের প্রয়োজনে যে শিক্ষা গ্রহণ করে, আর তাদের ওপর জোর করে যে শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হয়, এ-দুয়ের কার্য্যকারিতায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। দুটো শিক্ষাকেই সে মনে রাখতে পারে; তবে প্রথমটিকে সে মনে রাখতে 'চায়', আর দ্বিতীয়টিকে মনে রাখতে 'না পারলেই' সে খুশী হয়। 'এক কথা একশোবার বললেও তোর মাথায় ঢোকে না কেন বল্‌তো?'—এ প্রশ্নের জবাব প্রশ্নকর্ত্তারই দেওয়া উচিত, অবশ্য তার আগে তাঁকে মনোবিজ্ঞানের দুচারকথা জানতে হবে, মানতে হবে।

কারখানার মালিক।—তিনি চান কারখানার কাজ খুব জল্‌দি চলুক, অল্প সময়ে বেশি কাজ হোক্। কি করা যায়? তিনি ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের আশ্রয় নিলেন—কি করে কারিগরদের নিপুণতা বৃদ্ধি করে বেশী উৎপাদন করা যায়। তিনি কারখানায়

প্রত্যেক কর্মচারীই অল্পবিস্তর ভাববেন যে, তিনি ম্যানেজার হলে কিভাবে একাজে এগুতেন। এটা তাঁদের মনে নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা শুভঙ্কর উচ্চমন্যতা সৃষ্টি করবে। কর্মচারী হয়েও প্রতিষ্ঠানের উন্নতির ব্যাপারে তাঁদের অভিমত জড়িয়ে থাকবে, এই চিন্তা তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব-চেতনা জাগাবে। ম্যানেজার বা ডিরেক্টরের মতই তাঁরা আন্তরিক হবেন অফিসের পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবার কাজে। দায়িত্বশীল হবার আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে; শুধু প্রয়োজন সেই সৎ-আকাঙ্ক্ষাকে যথাযোগ্য সমাদর করা।

এতক্ষণ ধরে মানসিক প্রভাব বিস্তারের প্রথম ও প্রধান নীতি নিয়েই আলোচনা হল। এবারে দ্বিতীয় নীতির আলোচনায় আসা যাক্। এই নীতিটি হচ্ছেঃ "আপনাকে ভালবাসতে হবে মানবজাতিকে।" দার্শনিক গন্ধ আছে খুবই এই কথাটিতে। হাজার হলেও দর্শনশাস্ত্রই তো মনোবিজ্ঞানের আদিপুরুষ। তবে সে যাই হোক্, মানুষের উপর আপনি বেজায় চটা, লোকের খুঁত-ধরা যদি আপনার স্বভাব হয় (অবশ্য একথা কেউ স্বীকার করেন না!) —তাহলে মানুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তারের আশা আপনি করতে পারেন কি করে?...ছাত্রের সামান্য ত্রুটি দেখলেই শিক্ষক যদি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন,—"ওরে ছোঁড়া তোর পিঠের ছাল তুলে ফেলব!"—তাহলে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুভূতির পারস্পরিক অবস্থান হবে শত যোজন দূরে। কেননা, জীবন্ত মানুষের প্রতি ঐ ধরনের সম্ভাষণ ও ভীতিপ্রদর্শন (কোন গুরুত্ব দিয়ে না বললেও) মোটেই সহানুভূতির পরিচায়ক নয়। সহানুভূতি ছাড়া সহযোগিতাই

যা পাবেন কি করে, আর প্রভাব বিস্তার তো স্বপ্নেই থেকে যাবে! ক্যানভাসারের সঙ্গে খদ্দেরের মন-কষাকষি থাকলে ক্যানভাসিংএর কথাই উঠবে না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, বন্ধু হলেই প্রভাব বিস্তার করা সহজ হবে। বন্ধুকে আপনি ভালবাসেন না, একথা বলতে চাই না। তবে একটা সত্যিকথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, বন্ধুত্ব অনেক সময়ে স্বার্থজাত হয়। এ ধরনের বন্ধুত্ব যখন স্থাপিত হয়, তখন মনে হয় বুঝি মনে মনে সহানুভূতির সেতু বাঁধা হয়েছে। কিন্তু এই সংযোগকে সেতু না বলে চলতি পথের বাস-স্টপ বলেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়,—জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কথা বলা শেষ করতে না করতেই বাস দেয় ছেড়ে। প্রভাব বিস্তার করা আর হয়ে ওঠে না।

তৃতীয় নীতিঃ "আপনাকে বুঝতে হবে সকল মানুষকে।" সকলেই চায় পরিচিতি লাভ করতে। পরিচিতি না পেলে অনেক সময় মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। কোন ছেলেকে কেউ যদি গ্রাহ্য না করে, কারুর নজরেই যদি সে না পড়ে, তবে অপকৌশল অবলম্বন করে সে তার দিকে সকলের দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা করবে। এটা ছেলেমেয়েদের দোষ নয়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মাত্র। এই অপকৌশল বাড়তে বাড়তে এক জটিল অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি হয়, তখন মনে হয়, সে বুঝি জন্ম থেকেই এইরকম বেয়াড়া।

অতএব মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হলে তার অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখের কথা বুঝতে হবে। আপনি যদি বুঝতে পারেন, তার কষ্ট কি—তবেই তাকে ভালবাসতে পারবেন। তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে আপনাকে একাজ করতেই হবে।

চতুর্থ নীতি ঃ "আপনি যা করছেন, তার ওপর আপনার নিজের বিশ্বাস থাকা দরকার।" ছাত্র, শ্রোতা, খদ্দের—এদের সাড়া কতটুকু হিসেব করলেই শিক্ষক, বক্তা, ক্যানভাসারের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

যে বিষয়ে ছাত্রকে শিক্ষাদান করছেন, যে নীতি শ্রোতাদের সামনে ব্যাখ্যা করছেন, যে মাল খদ্দেরকে গছাতে চাইছেন—তার প্রয়োজনীয়তা এবং উৎকর্ষ সম্পর্কে যতক্ষণ না নিজে দৃঢ়বিশ্বাসের অধিকারী হতে পারছেন, ততক্ষণ আপনি কারুর মনের ওপর প্রভাব বিস্তারের আশা করতেই পারেন না। ফাঁকা বুলি আউড়ে একাজ কখনই করা যেতে পারে না। সংস্কৃত শেখার উপযোগিতা কি, সে বিষয়ে আপনার নিজেরই যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে ছাত্ররা আপনার কাছ থেকে ভাল সংস্কৃত শিখবে কেমন করে?

মানুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তারের সময় আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমরা কেউ খালি কলসী নই যে, যা ঢেলে দেওয়া হবে, তাই ভর্ত্তি করে বসে থাকব! আমরা সকলেই সজীব, কর্ম্মময় এবং গতিষ্ণু রহস্যময় মানবযন্ত্র। আমরা আমাদের প্রয়োজন নিজেরাই খুঁজে নিই, তা আমরা যতই বোকাহাঁদা, হাবাগোবা, কচিখোকা হই না কেন। আমাদের সব কাজই নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি। শিক্ষক বেত নাচিয়ে এক ক্লাশ ছাত্রের সামনে যত ভাল ভাল কথাই বলুন না কেন, ছাত্রের স্বাধীন আত্মার কাছে যতটুকু প্রয়োজনীয় বোধ হবে, তার চেয়ে এক কণাও সে বেশি নেবে না। শ্রোতার মন যা চায়, সেই কথা যে বক্তা বলতে পারেন না, প্লাটফর্মে দাঁড়ানোর সব প্রয়োজনই তাঁর ফুরিয়ে যায়।

সবচেয়ে ভাল হয় যদি সবাই গোল হয়ে বসে মন খুলে আলাপ আলোচনা করতে পারি। পরস্পরের জানাবার এবং জানবার কথা প্রাণ খুলে বলতে পারি, তাহলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানদাতা উভয়েই জ্ঞানের পরিধি বেড়ে চলে। এই ধরনের বৈঠকী আলোচনার সুফল অনেক। মনে করুন, আপনি আলোচনায় যোগ দেবার আগে কোন একটি বিষয়ের নামও কখনও শোনেননি। কিন্তু পারস্পরিক আলোচনার ফলে আপনি সেই বিষয়টির কথা জানতে তো পারলেনই, এমন কি সে বিষয়ে একটা সানন্দ আগ্রহ নিয়েও ফিরতে পারেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই যে স্বাধীন সংগ্রহনী ও সংগঠনী শক্তি আছে, তাকে যথাযোগ্য সম্মান ও সুযোগ যিনি দিতে পারেন, তিনিই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন, প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে সর্ব্বজনগণ্য হন। অতএব মানুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে মানুষকে নিজের চেষ্টায় কিছু করতে দিন, জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না মোটেই। তার স্বাধীনতার উদারতাই আপনাকে সাহায্য করবে তাকে প্রভাবান্বিত করতে। মানুষের চিন্তারহস্যের এ এক সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা, একথা না বললেও চলে। এতটুকু জোর জবরদস্তি চললেই এই সূক্ষ্ম পারস্পরিক সংযোগ-সাধন ব্যাহত হবে, উভয়ের অনুরাগ হয়ে পড়বে ভিন্নমুখী।

স্বপ্ন হ'লে সত্যি

নগেনবাবু কিছুদিন আগে প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখতেন এবং স্বপ্নটা প্রত্যেকবারই একরকম। সেটা হচ্ছে এই যে একদল লোক একটা মড়া খাটে করে নিয়ে যাচ্ছে, আর 'বলহরি—হরিবোল' বলে চীৎকার করছে!

ভয় পেয়ে তিনি জেগে উঠ্‌তেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা না ঘুমিয়ে কেটে যেত। কোন কোন দিন বিনিদ্র রজনী যাপন করার শেষে ভোরের দিকে একটু হয়ত তন্দ্রা এল, অমনি আবার সেই অমঙ্গলময় স্বপ্ন! ঘুম ভেঙ্গে যেত।...এই অদ্ভুত স্বপ্নের কি অর্থ, তা কিছুতেই তিনি ভেবে ঠিক করতে পারতেন না। রাত জেগে জেগে তিনি

পাগল হবার জোগাড় হলেন। মাঝে মাঝে মনে হত, এ স্বপ্ন বুঝি তাঁরই আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত!

অবসর পেলেই তিনি একলা বসে বসে কেবলই ভাবতেন, কেন এই বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন? কেন?…তাঁর বাবা প্রায় বছরখানেক হল মারা গেছেন! কিন্তু সেটা তাঁর মনে এতখানি আঘাত দিয়েছে যে, তার জন্যে এমন স্বপ্ন দেখতে হবে, একথা তিনি কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারলেন না।…এইভাবে গভীর চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একদিন তাঁর মনে পড়ে গেল যে, বাবার মৃত্যুর মাস কয়েক আগে একটা সামান্য ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে অতি অভদ্রভাবে ঝগড়া করেছিলেন। বাবা তাতে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর নগেনবাবু এর জন্যে নিজেকে কয়েকবার ধিক্কার দিয়েছিলেন; তারপরে জিনিসটা সচেতন মন থেকে নেমে যায় অবচেতন স্তরে। এই তীব্র আত্মগ্লানি অবচেতন-কক্ষে রুদ্ধ হয়ে থাকলেও স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাবার চেষ্টা করত। অবচেতন ভাবত: "আমার রুক্ষ ব্যবহারের জন্যেই বাবা এ জগৎ ছেড়েছেন! আমিই দোষী! আমিই ভুল করেছি!"

আশ্চর্য্য! যখনই নগেনবাবু অবচেতন স্তরের ঐ রুদ্ধ গ্লানিটুকু সচেতন স্তরে পুনরুদ্ধার করতে পারলেন, তারপর থেকেই তাঁর ঐ বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেছে!

অবশ্য সমস্ত স্বপ্নই এত সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ অধিকাংশ স্বপ্নই এতখানি বিরক্তিকর স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। মনের গভীরতম প্রদেশে কোন বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি না হয়ে থাকলে সাধারণত আমরা স্বপ্ন ভুলেই যাই। বোধ হয়, ভুলে যাওয়াই ভাল!

আগেকার দিনে এবং এখনো অনেকে মনে করেন যে, স্বপ্নমাত্রই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। বাজারে স্বপ্ন-বিষয়ক চার আনা আট আনার যে বই কিনতে পাওয়া যায়, তাতে বলে, মৃত্যুর স্বপ্ন দেখলে জন্ম কিংবা বিবাহ ঘটে; টাকার স্বপ্ন দেখলে দিনকাল খারাপ যায়; রান্না ঘরের কালো ঝুলের স্বপ্ন দেখলে বিদেশ ভ্রমণ হয়; সাপের স্বপ্ন মানেই দুষ্ট বন্ধুর পাল্লায় পড়তে হবে;—এমনি সব রকমারী বিশ্বাসযোগ্য এবং অবিশ্বাসযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী থাকে ঐ সব বইতে। কয়েক বছর আগে বাংলা পাঁজীগুলোতেও 'স্বপ্নতত্ত্ব' নিয়ে অনেক কথা থাকত।

আপনি ঐ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করলে বলব,—ও-ভাবে সোজাসুজি উপায়ে কোন স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না; করলেও সেটা 'লাগে তাক্, না লাগে তুক্'-গোছের হবে। স্বপ্নের অর্থ অতটা বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়ায় সমীক্ষণ করা যায় না বটে, তবে বিজ্ঞান তারই সন্ধানে আজও কাজ করে চলেছে। বিজ্ঞান বলে, বোধ হয় একদিন স্বপ্নকে বাঁধাধরা ফর্মুলার মধ্যে আনা যেতে পারে। কেন না, স্বপ্ন-প্রতীক নিতান্তই বাজে নয়। তাই স্বপ্ন-সমীক্ষকেরা এখন বিশ্বাস করছেন যে, অবচেতন চিন্তার প্রতীকগুলি সচেতন চিন্তার প্রতীকের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় মেলে না বটে, তবে তাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছেই আছে।

যিনি জড়বাদ সমর্থন করেন, তিনি হয়ত এক্ষুণি একটু মুচকি হেসে বলে উঠবেন, "আরে মশাই, ওসব সূক্ষ্ম সম্পর্ক-টম্পর্ক বলে ব্যাপারটাকে হেঁয়ালীর মধ্যে আনছেন কেন? শরীরে অসুস্থতা থাকলে, কলকব্জা ঠিকমত না চললে, কিংবা বদ্‌হজম হলেই অমন দুঃস্বপ্ন

দেখে মানুষ! এই বললেই তো চুকে যায়। শরীরটাকে বাগে আনুন, টেনে ঘুম লাগান—স্বপ্ন পালাবার পথ পাবে না!"...এঁর কথা একেবারে ঠেলে ফেলবার নয়। কেন না, অবচেতন ও সচেতন কক্ষ দুটির মাঝখানে যে 'সেন্সর' আছে বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে, যে 'সেন্সর' অবচেতন মনের অবাঞ্ছিত চিন্তাকে সচেতন স্তরে আসতে দেয় না, শরীর দুর্ব্বল থাকলে তার কাজেও ঘটে যায় অনেকটা শিথিলতা; ফলে অবচেতনের বুদ্বুদ ফেঁপে উঠ্‌তে পারে সচেতন স্তরে, স্বপ্ন হয়ে।

প্রাচীন ধর্ম্মভীরু যাঁরা, তাঁরাও এখানে বলতে পারেন, "ওহে, দু'পাতা বিজ্ঞান পড়েই স্বপ্নটাকে অমন 'হতচ্ছেদ্দা'র চোখে দেখো না। আমাদের সকলের মধ্যে 'পরমাত্মা'র অধিষ্ঠান আছে জান তো? সেই 'পরমাত্মা' হল 'ব্রহ্মে'র অংশ। আমাদের সুপ্তিকালে সেই পরম ব্রহ্মের বাণী স্বর্গীয় প্রতীক নিয়ে স্বপ্নের আকারে আমাদের পথ দেখায়!"

মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু বলেন যে, অবচেতন মনের মধ্যে যে সব রুদ্ধ চিন্তা ও বাসনা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে, তাদেরই বিকৃত রূপ হল স্বপ্ন। যদিও তাঁদের কথাটাই এখন অধিকাংশ লোক নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মেনে নিচ্ছে, তবুও অন্যান্য মতবাদগুলোকে অর্থহীন বলে কোণঠাসা করার চেষ্টাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কেন না, শরীরের অসুস্থতার সঙ্গে বিদ্‌ঘুটে আর বেশী স্বপ্ন দেখার একটা প্রত্যক্ষ অনুবন্ধ দেখা গেছে।

মনে করুন, আপনি স্বপ্ন দেখেছেন যে, একটা ভয়ঙ্কর বুনো কুকুরের সঙ্গে আপনার লড়াই হচ্ছে। আপনি কুকুরটার কামড়ে

ক্ষতবিক্ষত হয়েও তাকে বেদম প্রহার দিয়ে সাবাড় করে ফেললেন !...সমীক্ষা করে হয়ত দেখা যাবে, কুকুরটা হচ্ছে আপনারই দেহের কোন কষ্টকর ব্যাধির প্রতীক, যার সঙ্গে আপনার প্রাণপণ সংগ্রাম চলছে ; আপনি ব্যাধিকে জয় করবেনই—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতিরূপই হল ঐ স্বপ্ন ! কিন্তু আপনি যদি 'স্বপ্নতত্ত্বে'র বই দেখেন, হয়ত দেখবেন লেখা আছে, কুকুরের স্বপ্ন মানে কোন ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঘটবে ! ব্যাস, আপনি ঘাব্‌ড়ে গেলেন, আর ঘাব্‌ড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের সংগ্রামী শক্তিও হয়ে পড়ল হীনবল। রোগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল, সত্যি সত্যিই (ভগবান না করুন) আপনার একটা বড় রকমের অমঙ্গল ঘটে গেল !

অনেক স্বপ্ন ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে অদ্ভুত রকম মিলে যেতেও দেখা গেছে। সুদূর ইউরোপে কোন প্রিয়জন মারা যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় গভীর রাত্রে ঘুমের মাঝখানে তার মুখখানি স্বপ্নে ভেসে উঠেছে—এই জাতীয় রোমহর্ষক আধিভৌতিক কাহিনীর একাধিক পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাই মনে হয়, ব্যাপারটার মধ্যে খানিকটা উপাদেয় রহস্য এখনও বিজ্ঞানের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে।

অবচেতন মনের ভবিষ্যদ্বাণী করবার ক্ষমতা আছে কিনা, সে বিষয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষা করতে ছাড়েনি। মনে করুন, আপনার মনে অহোরাত্র এক চিন্তা—কি করে একটা চাকরী জোগাড় করা যায় ! এ-চিন্তা দুশ্চিন্তা নয়, বরং দৃঢ় সঙ্কল্পই। ক্রমে এই তীব্র বাসনা অবচেতনে আস্তানা পাত্‌ল। একদিন আপনি স্বপ্ন দেখলেন যেন নতুন চাকুরী হয়েছে আপনার, আপনি কড়্‌কড়ে মাইনে এনে মায়ের

হাতে তুলে দিচ্ছেন হাসিমুখে।···এদিকে সেই তীব্র বাসনা, দৃঢ় সঙ্কল্প অবচেতন কক্ষ থেকে আপনার অজান্তেই প্রতিমুহূর্ত্তে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আর প্রেরণা জোগাতে থাকল আপনার প্রতিটি স্নায়ুতে। আপনার প্রতিটি স্নায়ু এমন কর্ম্মক্ষম, সতেজ হয়ে উঠল যে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রকমারী দক্ষতা আপনার কাছে জলের মত সহজ বোধ হতে লাগল! আপনি সফল হলেন আপনার সাধনায়,—স্বপ্ন হল সার্থক!······

অবচেতনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতাটা কোথা থেকে পাওয়া গেল, সে কথাটা মনোবিজ্ঞানীরা বোঝাতে চেয়েছেন মনের স্বর্গীয় ক্ষমতা-সম্পন্ন 'ইচ্ছাশক্তি'র সাহায্যে। ইচ্ছাশক্তি যখন সত্যিকারের তীব্রতা লাভ করে, তখন আপনার অজান্তেই সে আপনাকে আপনার অভীষ্ট পথে টেনে নিয়ে চলে শত ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করেও! ভারী রহস্যময় এই ইচ্ছাশক্তি! মনের যে সমস্ত বাসনা প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে, তারা যে সব স্বপ্নের সৃষ্টি করে, তাদের যে অনেকখানি ভবিষ্যদ্বাণী করবার ক্ষমতা থাকে—এখন নিশ্চয়ই সেকথা মানতে আপনার বিশেষ দ্বিধা বোধ হবে না।

অনেকে বলেন, ভোরের স্বপ্ন নাকি ফলে যায়। এর পেছনে একটা যুক্তি থাকতে পারে। সারারাত ঘুমের মধ্য দিয়ে স্নায়ুগুলি বিশ্রাম লাভ করবার পর রাতের শেষ প্রায় সম্পূর্ণ শিথিলতা লাভ করে, অর্থাৎ গভীর প্রশান্ত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এইটুকু যদি আপনি মেনে নিতে পারেন, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, অবচেতনের গভীর অন্তরে প্রবেশ করবার বা সেখানকার রুদ্ধ চিন্তা বাইরে বেরিয়ে আসবার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। তাই

মনে হয়, ভোরের দিকে আমরা যে সব স্বপ্ন দেখি, সেগুলিই সত্যিকারের মনের হাঁড়ির খবর এনে দেয়। আগেই বলেছি, আপনার বাসনা বা সঙ্কল্প যতই অবচেতনের গভীরতর থেকে গভীরতম প্রদেশে আস্তানা পাত্‌তে থাকবে, আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার ভবিষ্যতের ওপর তার প্রভাব ততই দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্জ্জয় হয়ে উঠ্‌বে। এই ফর্মুলা অনুযায়ী ভোরের স্বপ্নকে খতিয়ে দেখলে বুঝবেন আপনার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেওয়ার কাজে এ এত নাম কিনেছে কেন! এ কথাটা পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানীরা এখনো মনে-প্রাণে মানতে পারেন না বটে, তবে হাজার হাজার বছর আগে এই ভারতভূমির নাম-না-জানা অনেক মুনি-ঋষিই একথা আমাদের শুনিয়ে গেছেন। এখানে কেবল তাঁদের উক্তিকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মর্য্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হল মাত্র,—কোন নতুন কথা নয়।

মনঃসমীক্ষার কাজে স্বপ্ন অনেকখানি কাজে লাগে। এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা হরেকরকম পরীক্ষাও করেছেন। আপনার মনের যে সব নির্জ্ঞান চিন্তা আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, তাদের ধরে ফেলে যদি সনাক্ত করতে চান, তাহলে স্বপ্নকে অবহেলা করবেন না। আপনি যদি কোন মানসিক অস্থিরতায় নাকাল হয়ে মনের ডাক্তারের কাছে যান, তিনিই আপনাকে হয়ত বলবেন যে, আপনি রোজ যে স্বপ্ন দেখেন, ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি যতটা পারেন খুঁটিয়ে লিখে রাখবেন। কিন্তু মুস্কিল কি জানেন, স্বপ্ন ভেঙে গেলেই তার বিষয়বস্তুগুলো যেন হুটোপুটি করে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করে; ভোরবেলা রান্নাঘরের দরজা খুললে ইঁদুর-গুলো যেমন ঝট্‌পট্‌ হাঁড়িকলসীর পেছনে দৌড় মারে—অনেকটা

সেইরকম ! তাই কোন স্বপ্নকে খুঁটিয়ে লিখতে লিখতেই আদ্দেক কথা ভুলে যেতে হয় ! তবুও যদি রোজ কিছু কিছু লিখে চলেন, তাহলে সবগুলোর মধ্যে থেকে একটা সাধারণ কারণ বার করা খুব শক্ত হবে না।

মনঃসমীক্ষক ঐ সূত্রগুলিকে অবলম্বন করে তাঁর সন্ধান সুরু করবেন ঠিক গোয়েন্দার মতই। আপনি নিজেও আত্মসমীক্ষা করতে পারেন, এবং তার জন্যে খুব বেশী বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকলেও চলবে। তবে নিজের ওপর গভীর সততার মনোভাব বজায় রাখতে হবে। যত নোংরা যত নিন্দনীয় চিন্তাকেই আত্মসমীক্ষার সাহায্যে উদঘাটন করুন না কেন, বিনা দ্বিধায়, বিনা যুক্তিতে তাকে বিবেচনার জন্যে গ্রহণ করতে হবে।

স্বপ্নের এক-একটা সূত্র নিয়ে নীরবে নিভৃতে গভীর চিন্তা করুন ; মনোবিজ্ঞানের অনুষঙ্গ পদ্ধতির রীতি অনুযায়ী এক-একটি সূত্র আপনাকে অনেক আশ্চর্য্য তথ্যের সন্ধান এনে দেবে। সেগুলোকে লিখে রাখুন, তাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করুন। দেখবেন, হয়ত কোন্ সুদূর অতীতের, এমনকি শৈশবের বহু অতৃপ্ত বাসনা বাস্তব জগতে আত্মপ্রকাশের জন্যে কতই না আঁকুপাঁকু করছে। কেউ কেউ এমনও বলেন যে, মনের অসামাজিক আদিম পশুপ্রবৃত্তিগুলোও স্বপ্নের মধ্যে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে! কারণ বাস্তব জগতে তাদের মুখদেখানো আমরা নিষিদ্ধ বলে গণ্য করেছি।

বহুদিন আগে মহামনীষী প্লেটো বোধ হয় এইজন্যেই বলেছিলেন

যে, তুমি যদি সৎ হও, তাহলে তোমার মনের অবাঞ্ছিত অসামাজিক প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি লাভ করবে স্বপ্নজগতে ; যদি হও অসৎ, অসংযমী —তাহলে তাদের করবে বাস্তবে রূপায়িত !

মুখদর্পণে কি দেখি?

দৈহিক আকৃতি বিচার করে মনের প্রকৃতির হিসাব করাটা মনোবিজ্ঞানের পর্য্যায়ে পড়ে কিনা, সে বিষয়ে এখনো অনেকের সন্দেহ আছে। সাধারণত এদেশে জ্যোতিষীরাই এই রহস্যের অধিকারী বলে আমরা মনে করে থাকি। তিল, জরুল, জোড়া ভ্রূ, উঁচু কপাল—এসবের লক্ষণ দেখে এখনও প্রাচীন ব্যক্তিরা মানুষের প্রকৃতি বিচার করবার চেষ্টা করে থাকেন। বছর দশেক আগে পর্য্যন্তও বাংলা পাঁজিতে তিলতত্ত্ব, জরুলতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা থাকত। এ-সবের সত্যতা কতটুকু, মনের প্রকৃতির সঙ্গে দেহের আকৃতির সম্পর্ক কতখানি—তা নিয়ে এখনো গভীর গবেষণা চলছে।

কিছু মনে করবেন না আপনি কি এই ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন? যদি বলি, 'আপনার থুতনিটা চাপা, অতএব আপনার ইচ্ছাশক্তি ভারী দুর্ব্বল না হয়ে যায় না!'—আপনার মুখ দিয়ে আপনা হতেই বেরিয়ে পড়বে,—'বাজে কথা!'…কিন্তু উপায় নেই, বৈজ্ঞানিকরা বহু গবেষণার পরেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রেও দেহের খুঁটিনাটি চিহ্ন, চুল থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত, সর্ব্বাঙ্গের আকৃতি বর্ণ বিচার করে মানুষের প্রকৃতি নির্ণয়ের রহস্যজনক প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই। সেগুলোর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখতে না পাওয়ার দরুণ আমরা অনেকক্ষেত্রে সেগুলো মানতে রাজী হই না। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানীরা শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে অনেক পারস্পারিক সম্পার্কবিশিষ্ট সূক্ষ্ম-রহস্য জানতে পেরেছেন এবং পারছেন—যার ফলে আশা হচ্ছে, এ-বিষয়ে হারানো বিশ্বাস হয়ত আবার ফিরে আসতে পারবে। অবশ্য আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের উক্তিগুলোর পেছনে অনেকখানি বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও গবেষণা যে অনেককাল আগেই হয়েছিল, এ-কথাটাও ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

মনোবিজ্ঞানীরা চান সত্যেকে উদ্‌ঘাটিত করতে। আপনার থুতনি দেখে বলে দেওয়া হল—আপনার ইচ্ছাশক্তি কমজোরী। অমনি মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন, 'যুক্তি দেখাও'! সত্যিই তো, যুক্তি ছাড়া কি করেই বা মানা যায়? হয়ত এই যুক্তির সন্ধান করতে করতে মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে জটিল রহস্য 'ব্যক্তিত্ব' সম্পর্কে আমরা অনেকখানি আলো পাব। যে কোনও লোকের ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হবে তখন ছকে-ফেলা অঙ্কের মতই সহজ।

একটা কথা আমরা সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে থাকি, সেটা হচ্ছে এই যে, বন্ধু হতে হলেই মনের মিল থাকা দরকার। আপনার বন্ধু যারা তাদের সঙ্গে আপনার মনের প্রকৃতির অনেকখানি যে মিল আছে, তা বললে কিছু বাড়িয়ে বলা হবে না। কিন্তু মন যদি দৈহিক আকৃতি দেখে বুঝতেই পারা যায়, তাহলে আপনার বন্ধুদের সকলেরই থুতনি কমবেশী চাপা হওয়া উচিত! প্রকৃতপক্ষে তা কি হয়?……দেহের আকৃতি দেখে যাঁরা মনের প্রকৃতি বিচার করবার চেষ্টা করেন (এঁদের "মুখদার্পণিক" বললে কেমন হয়?), তাঁরা এইখানে মাথা চুলকোতে থাকেন। থুতনি চাপা বলে আপনার ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আপনাকে খোঁটা দেওয়া হয়েছিল। এখন আপনি নিশ্চয়ই হাঁফ ছেড়ে বলবেন, 'যাক্, ব্যাপারটা তাহলে বোগাস্!'

আচ্ছা, এবার মানুষের মেজাজ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্ এই প্রসঙ্গে। মানুষের মধ্যে যতরকমের মেজাজ বা প্রকৃতি দেখা যায়, সে-গুলোকে মোটামুটি তিনটি পর্য্যায়ে ফেলতে পারি।—যেমন (১) কর্ম্মময়; (২) প্রাণময়; আর (৩) মেধাময় প্রকৃতি। একটা মুস্কিল এখানে বাধে, যদিও সেটা খুব বড় রকমের নয়। মুখদার্পণিকদের মতে প্রকৃতি হল মানুষের প্রভাবাত্মক বৈশিষ্ট্য। মনোবিজ্ঞানীরা এই বৈশিষ্ট্যকেই বলেন 'ব্যক্তিত্ব'। মনোবিজ্ঞানে 'প্রকৃতি' বলতে মানুষের প্রক্ষোভগত জীবনের সাধারণ পরিচয়টাকেই বোঝানো হয়। তাই জেনে রাখা ভাল যে, মানুষের 'প্রকৃতি' ও 'ব্যক্তিত্ব' দুটো এক জিনিষ নয়, যদিও ব্যক্তিত্বের মধ্যেই প্রকৃতির হিসাব পাওয়া যায়। আপাতত মুখদার্পণিকদের সংজ্ঞাই মেনে

নেওয়া যাক্ এবং 'প্রকৃতি' বলতে 'ব্যক্তিত্বে'র কথাই বোঝা যাক্।

কর্ম্মময় প্রকৃতি হবে তেজোময়, বেগবান আর শক্তিশালী,—সেই সঙ্গে থাকবে তীব্র অনুভূতি, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। কর্ম্মময় প্রকৃতি মানুষকে একটা দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ এনে দেয়, যার ফলে মানুষ অনেক সময়ে নিজেকে সামলাতে পারে না। সময় সময় হঠকারিতার মধ্যেও পা দিয়ে ফেলে। তৎপরতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত—এই সব গুণগুলি এই প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। কর্ম্মময় প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের কপাল, নাক থুতনি এবং চোয়ালের মাংসপেশী, হাড় ও স্নায়ুগুলির বিশেষ বৃদ্ধিলাভ ঘটে। জেনে রাখুন, এঁদের মুখ হয় অনেকটা চৌকো ধরনের!

প্রাণময় প্রকৃতিতে প্রাণশক্তির প্রচুর সমাবেশ পাওয়া যাবে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এক পা এগিয়ে দু'পা পেছুনো আর স্থায়িত্বের দিকে বড় বেশী ঝোঁক দেখা যাবে। 'আমোদে থাকব, আনন্দ করব, সবার সঙ্গে মেলামেশা করব, হৈ-হুল্লোড়ে কেটে যাবে দিন'—এই হল প্রাণময় প্রকৃতি-সম্পন্ন মানুষের মনের ইচ্ছে। এঁরা সাধারণতঃ আমুদে আর মিশুকে লোক হন। শরীর হয় দিব্যি নানুস্-নুদুস্, দেহের হাড়গুলো মাংস ঠেলে বেরুবার কোন সুযোগই পায় না! মুখ হবে বেশ গোলগাল (চাঁদপানা?)! মিষ্টার চার্চিল আর ক্রুশ্চভ্কে বোধ হয় এই পর্য্যায়ে ফেলা যায়!

মস্তিষ্কের প্রাধান্য যার বেশি হবে, প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ যার হবে উজ্জ্বল, আমরা বলব সে মেধাময় প্রকৃতি নিয়ে জগতে এসেছে। সাধারণত সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি এবং

সমাজ-সংগঠকেরাই মেধাময় প্রকৃতির অধিকারী হন। বিবেকের কঠোর শাসন সর্ব্বদাই চলে তাঁদের রিপুগুলির ওপর। মেধাময় প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের মুখের আকৃতি হবে, (হাসবেন না!) অনেকটা ন্যাসপাতির মত; কপাল হবে চওড়া উঁচু, আর চিবুক পড়বে ঝুলে। দেহের হাড়গুলো হবে ছোটখাট, চেহারা ছিপছিপে, হাত ও পায়ের পাতাগুলি ছোট।

মুখদার্পণিকদের গবেষণা অনুযায়ী এই তিন শ্রেণীর প্রকৃতিই মনুষ্য সমাজে বিরাজমান। এখন আসুন, মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার পথ ধরে মুখদার্পণিকদের মুখ রক্ষা করা যায় কিনা দেখা যাক্!

মনোবিজ্ঞানে যে ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়ে থাকে, তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক মতবাদেরই সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখানে তাদেরই মধ্যে এমন একটি মতবাদ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে চেষ্টা করব, যার শ্রেণী বিভাগ ঠিক মুখদর্পণবাদের মতই তিনটি।

মনোবিজ্ঞানীদের এই মতবাদের প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্বে থাকবে আরামপ্রিয়তা, ভোজনবিলাস এবং বন্ধুভাব। এই ব্যক্তিত্ব খুবই সমাজপ্রিয় এবং স্বচ্ছন্দ। এই ধরনের মানুষের হজমের যন্ত্রগুলি খুব ভাল কাজ করে, কিন্তু মাংসপেশীগুলি দৃঢ় হয় না। ফলে, দেহটি বেশ থলথলে হয় এবং চর্ব্বি জমতে থাকে। মুখদর্পণের প্রাণময় প্রকৃতির সঙ্গে এই শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের অনেকখানি মিল আছে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের মাংসপেশী হয় বেশ সজীব এবং দৈহিক

কর্ম্মপটুতা থাক অসাধারণ। তাদের কাছে কর্ম্ম এবং শক্তিই জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভয়কে তারা জয় করে। মুখদার্পণিকদের মতে এরা কর্ম্মময়-প্রকৃতিসম্পন্ন। দেহের হাড়, মাংসপেশী, স্নায়ু—সমস্তই হয় সুপুষ্ট। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—টার্জান, মনতোষ রায়!

একাকী থাকতে ভালবাসে, কেউ কোন কাজ করতে গেলে বড় একটা উৎসাহ দেয় না—ব্যক্তিত্বের এই আর একটি শ্রেণী। সবকাজে ধীর-স্থিরভাবে এগুনো এঁদের স্বভাব। সমাজের রীতি-নীতি থেকে এঁরা যেন বেশ খানিকটা দূরেই থাকেন। মুখ-দার্পণিকরা এই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককেই মেধাময় প্রকৃতির পর্য্যায়ে ফেলেছেন বলে নিশ্চয়ই মনে করতে পারি। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এই শ্রেণীর লোকদের দেহের চেয়ে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় দ্রুত, তাই মুখের আকৃতি হয় লম্বাটে, থুতনির দিকে সরু। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মনোবিজ্ঞানীরা যেভাবে ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিভাগ করছেন, মুখদার্পণিকদের প্রকৃতি-বিভাগের সঙ্গে তার খুব বেশি অমিল নেই। মুখদর্পণ-বিজ্ঞান এখানে সমর্থন পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে বলতে পারি। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, মুখদার্পণিকদের সমস্ত কথাই হুঁ-হাঁ করে মেনে নিতে হবে। তবে এখন থেকে এঁদের কথায় কিছুটা কান দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের দেশে মেয়েদের কপাল উঁচু হলে তাকে 'টিপ্‌কপালী' বলা হয়ে থাকে! এবং মনে করা হয় যে, 'টিপ্‌কপালী' মেয়েদের ভবিষ্যৎ দুর্ভোগময়! কথাটা কতদূর সত্যি জানি না, তবে আধুনিক মুখদার্পণিক ও মনোবিজ্ঞানীদের কেউই অমন কথা বলেননি। তাঁরা

বলেন যে, উন্নত কপাল মেধার লক্ষণ। তবে কি মেধাবী হওয়াটাই মেয়েদের পক্ষে বিপজ্জনক? —এ প্রশ্নের জবাব গবেষকরাই দিতে পারবেন, আর পারবেন, যাঁরা বিদগ্ধ সাংসারিক, তাঁরা! অবশ্য আধুনিক নারী প্রগতি ও গণতন্ত্রের যুগে এই প্রশ্নের অনুকূল জবাব দেওয়াটা কারুর পক্ষেই বিশেষ নিরাপদের হবে না!

মনের শক্তি অপরিসীম। আমরা জানি, ক্রমাগত দুশ্চিন্তার ফলে সমস্ত দেহের ওপর কী মারাত্মক ক্ষতি নেমে আসে! হজম-শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, চোখের কোণে কালি পড়ে যায়, স্মৃতিশক্তি কমে আসে, ক্রমে ক্রমে মানসিক এবং তার থেকে শারীরিক দুর্ব্বলতা এনে দেয় কর্ম্মজীবনে বিষাদময় সমাপ্তি। এ তো চোখে-দেখা বাস্তব জীবনের কথা। কিন্তু জন্মের আগেও শিশুর নির্ম্মীয়মান প্রতিটি স্নায়ুতে পিতামাতার মনের ভালমন্দ সব রকম প্রভাবই ছাপ ফেলে দেয়। সেই অপরিসীম মানসিক শক্তি কাজ করতে থাকে সেই ভ্রূণের প্রতিটি স্নায়ুতে, আর তা গড়ে ওঠে সেই শক্তিরই প্রভাবান্বিত হয়ে। প্রাণিবিজ্ঞানীরাও আজকাল এই প্রভাবকে স্বীকার না করে পারেননি। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, এই প্রভাব শুধু মনে নয়, দৈহিক আকৃতি গঠনেও অনেকখানি অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই প্রভাব এত সূক্ষ্ম, এত রহস্যঘেরা যে, আধুনিক মানুষ তাকে আজও বুঝতে এবং বোঝাতে পারছে না।

প্রাচীন ভারতের মহর্ষিরা বিজ্ঞানসাধনা বা যোগবলেই হোক, এই সূক্ষ্ম রহস্যের অনেকখানি জেনেছিলেন। এবং তাঁরা তাঁদের সাধনার ফল অতি সংক্ষেপে সহজবোধ্য করে সকলকে জানিয়ে গেছেন। যুগে যুগে সেই জ্ঞান বিকৃত হয়েছে, দূষিত হয়েছে,

অপহৃতও হয়েছে। কিন্তু যা আছে, তাকে বোঝবার চেষ্টাও আমরা করি না; বলি, 'ওসব চাষাড়ে কথা!' জ্যোতিষরত্ন (খনার বচন), মনুসংহিতা, ত্রিপিটক প্রভৃতি শাস্ত্র গভীরভাবে পাঠ করলে এই রহস্যের অনেকখানিই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার মাপকাঠি নির্ণীত হয় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ভিত্তিতে, যদিও জানি যে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং আগ্রহের সঙ্গেই ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলি থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে থাকেন। গভীর গবেষণার পর সেগুলিকে নিজেদের মতবাদের পোষাক পরিয়ে ঢাউস্ ঢাউস্ বই লিখে তাঁরা ছড়িয়ে দেন সারা বিশ্বে। আমরা তা পড়ি, আর বলি, 'আহা মরি!' তাঁদের এই সাধনার প্রশংসা করি অকুণ্ঠচিত্তে। কিন্তু আমরা, ভারতীয়েরা, কেন এই রহস্যের সন্ধানে বেরুই না? অভিজ্ঞ শাস্ত্রবিদ্ যাঁরা, তাঁরা কেন শাস্ত্র-নির্দ্দেশগুলির পেছনে যে যুক্তি আছে, সেগুলি সম্পর্কে গবেষণা করেন না? সেই সব গবেষণার ফল যদি সর্ব্বসাধারণের কাছে সহজ ভাষায় উপস্থিত করা যায়, তবে ভারতের প্রাচীন বহুমূল্য বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার ঘটবে, এদেশের মানুষ নিশ্চয়ই লুপ্ত বিশ্বাস ফিরে পেয়ে নবজীবন ও শান্তির আলো দেখবে।